KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : 34/2 Mohim Haldar St. Cal-26
Collection : KLMLGK	Publisher : Dhira Bhattacharya
Title : অনুরাগ (ANURAAG)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 13 15 17 22	Year of Publication : Jan 1998 Sep 1998 May 1999 Jan 2001
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : Dhira Bhattacharya	Remarks :

CD Rod No : KLMLGK

শারদীয়

অনুরাগ

পঞ্চদশ সঙ্কলন ঃ আশ্বিন ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

আটটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ
চারটি গল্প-উপন্যাস
কুড়িটি কবিতা-ছড়া
একটি পুস্তক পরিচয় ও
চিঠি, মতামত, সম্পাদকীয় বক্তব্য সহ মোট প্রায় অর্ধশত রচনা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ সর্বাধ্যক্ষ ঃ শান্তি রায়
পৃষ্ঠপোষক ঃ দীপালী চৌধুরী, মীনা বসু, বিউটি মজুমদার, অপরেশ সেন।

অনুরাগ

পঞ্চদশ সংকলন ঃ আশ্বিন ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী ঃ অর্চিতা রায় চৌধুরী, জয়ন্তী সান্যাল,
সাংগঠনিক প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

পঞ্চদশ সংকলন ঃ আশ্বিন ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

রাগানুগ

কলকাতা দিল্লি মুম্বই ৩

চিঠি

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ ৪

প্রবন্ধ নিবন্ধ ভ্রমণ

নজরুল ☐ সৌ. ঠা. ৫ জীবনানন্দ ☐ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৭ উদয়শঙ্কর ☐ বিশ্বনাথ ঘোষ ৮ জয়সলমীর ☐ দীপালী চৌধুরী ৯ জীবনানন্দের ঘোড়া ☐ সৌভিক জানা ১৬ ত্রিস্তরীয় ভাষা ☐ বিউটি মজুমদার ২১ লেখক ও সমাজ ☐ ধীরা ভট্টাচার্য ২৭ তারাশঙ্কর ☐ দেবাশিস গুহ ৩২

গল্প উপন্যাস রম্যরচনা

রবিন দে ৩৫ সুধা চট্টোপাধ্যায় ৪০ হরি ভট্ট ৪৪ সুব্রত চক্রবর্তী ৫২

কবিতা ছড়া

মতি মুখোপাধ্যায় ৫৮ রমলা বড়াল ৫৯ নীরেন্দ্র গুপ্ত ৬০ ধরিত্রী চক্রবর্তী ৬০ ওমর আলী ৬২ বিশ্বনাথ মাঝি ৬৩ আরাধনা গুপ্ত ৬৪ পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ৬৫ মানিকচন্দ্র দাস ৬৫ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬ অর্চিতা রায় চৌধুরী ৬৬ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ ইরা চক্রবর্তী ৬৮ সিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯ বাজীরাও সেন ৭০ জয়ন্তী সান্যাল ৭১ গৌরী মল্লিক ৭১ শিল্পীমিত্র ৭২

পুস্তক আলোচনা

বাংলার প্রকৃত নবজাগরণ ☐ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৭৪

মতামত

প্রদীপ মণ্ডল ☐ কুন্তলা দেবী ☐ রবিন দে ☐ জগৎ দেবনাথ ☐ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৯

সত্য প্রেস, ১০/২এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

পাঁচ টাকা

কলকাতা দিল্লি মুম্বই

১৯৯৮-এর ২৭ মে তারিখে পত্রিকায় তিনটি খবর বেরিয়েছিল।

এক। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৭৩ তম অধিবেশন হবে দিল্লিতে। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে মূলত বাংলাদেশি এবং ভারতীয় বাঙালিদের এই সম্মেলনকে 'বিশ্ব অধিবেশন' আখ্যা দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানিয়েছেন, দিল্লির এই অধিবেশনে দু' হাজার প্রতিনিধি আসবেন বিদেশ থেকে। দেশের প্রতিনিধির সংখ্যাও দু' হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

দুই। মুম্বইয়ের বিখ্যাত বর্ষীয়ান শিল্পী তাঁর আঁকা নগ্ন ছবির জন্য তিনি লিখিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

তিন। ভাষা শহিদ স্মারক সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ পার্কে বাংলা ভাষা শহিদ স্মারকের উন্মোচন হয়। ঢাকা ও শিলচরের ভাষা শহিদদের স্মরণে ওই স্মারকটি স্থাপিত হল।

২৭,৫,৯৮ তারিখের পত্রিকায় কলকাতা, দিল্লী, মুম্বইয়ের তিনটি খবরই গুরুত্বপূর্ণ।

এবারে আমাদের নিবেদন ঃ ঢাকার শহিদদের কথা মোটামুটি সকলেই জানি। শিলচরের শহিদদের আন্দোলন, তাঁদের নাম ধাম পরিচয় ও দাবি এবং তার ফলাফল বিষয়ে লিখে কেউ পাঠালে তা 'অনুরাগ'-এ সযত্নে প্রকাশিত হবে। লেখার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে দরকার মনে করলে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য 'সুকৃতু' শ্রীগৌরাঙ্গপল্লী, শিলচর ৭৮৮০০২ কাছাড়, আসাম—ঠিকানায় যোগাযোগ করতেও পারেন।

একটি চিঠি

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ

শ্রীযুক্ত প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আমি বন্ধু, বিশ্বনাথ ঘোষ। আমার বড়দি শ্রীমতী শান্তি রায়, ছোটদি শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্য।

এবার আমার দুটি কথা শুনুন।

এক অনুরাগের জন্মদিন ৯,৫,৮১ এখন এগার বছরের কৈশোরত্ব ঘুচিয়ে সতর বছরের যুবক বলতে পারেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদি—এনাদেবী ও তাঁর স্বামী ডাক্তার এন্, আর্, রে। ছেলে রণেন রে—ভাল অভিনেতা ছিল! আর মেয়ে কৃষ্ণা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এসেছিলেন ঋর্ষ ফ্রান্স থেকে কলকাতায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মিত্র পক্ষকে সাহায্য করতে। তখন ঋর্ষ'র সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ হয়। সম্প্রতি ঋর্ষ'র ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট হবার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ তিনি মারা গেছেন এবং কৃষ্ণা অনেক দুঃখের মধ্যে প্যারিসে আছেন। আমার অল্প বয়সী বন্ধুটিকে বলেছেন কলকাতার বিশু ঘোষকে আর তান্তু দে কে এখনও আমি চিনি। এঁরা সৌম্য মামার ১০০ বছর পূর্তিতে কোন অনুষ্ঠান করলে আমি (কৃষ্ণা) তাঁদের সাহায্য করতে ইচ্ছা করি। শুভেচ্ছান্তে

আপনাদের বিশ্বনাথ ঘোষ ১১,৫,৯৮

অনুরাগের নিয়মাবলী

আপনার ভাল লেখা, ছোট লেখা অনুরাগের জন্য পাঠাবেন। জেরক্স কপি পাঠাবেন না। কাগজের একপিঠে লিখবেন।

প্রতি ইং মাসের তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যায় সাহিত্য সভা বসে। সম্পাদকের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা তখনই করতে হবে। অন্য সময় তাঁকে পাওয়া যাবে না।

অনুরাগীদের সকলকেই আর্থিক সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান হচ্ছে। মানি অর্ডার ও চেক পাঠাবেন শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্যের নামে।

বিজ্ঞাপন দিয়েও সহায়তা করতে পারেন 'অনুরাগ' কে।

নজরুল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৪.৫.১৮৯৯—২৯.৮.১৯৭৬]

একদিন একটি নতুন কাগজ নজরে পড়ল। পত্রিকাটির নাম 'লাঙল'। চিঠি লিখলুম লাঙলের অফিসের ঠিকানায়। দলের তরফ থেকে শামসুদ্দিন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোয় এলেন। লাঙলের অফিসে গিয়ে মুজফ্ফর আহমেদ, নলিনী গুপ্ত, হালিম সাহেব ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় হল। দু দিন বাদে আবার গিয়ে হেমন্ত সরকার ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ হল।

নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। সে কবিতা পড়ল, গান গেয়ে শোনালে। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালোই লেগেছিল নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে! সবল শরীর, ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের গলার মতো পাৎলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি, সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিল ভারী, গলায় যে সুর খেলত খুব বেশি তা বলতে পারিনে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিল যাদু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়ত শ্রোতার বুকে। অনেক চিকন গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগত। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলতুম—অমন কাংস্য-বিনিন্দিত সুরে গান নাই-বা গাইলে নজরুল? সে দু'হাত দিয়ে তার গলাটিকে বেড়ে ধরে হেসে বলত—কেন? এতখানি গলা রয়েছে, তবু তুমি আমাকে গান গাইতে মানা করছ? এই বলে হাহা করে হেসে উঠত। প্রাণ ছিল তার ঐ হাসির মতোই সরল প্রবল ও দরাজ।...প্রবল হতে সে ভয় পেত না, নিজেকে মিঠে দেখাবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করত না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসে নি বাঙলা দেশে। এমন সহজ-

গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাঙলা সাহিত্যে বিরল।... নজরুলের কবিতায় কৃত্রিমতার দুর্গন্ধ আদবেই নেই, মনের হিমাদ্রি থেকে ভাবের জমাট বরফ কল্পনার সূর্যালোকে গলে নেমে এসেছে দুর্বার ধারায়। ভাব নিজের ছন্দ নিজেই তৈরি করে নেমে এসেছে, ছন্দ সৃষ্টি করার জন্যে তাকে প্রয়াস করতে হয় নি। 'লাঙলে' বের হল নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। একদিনের মধ্যে 'লাঙল' সব বিক্রি হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হোলো। নজরুলের কবিতাই ছিল 'লাঙলে'র প্রধান আকর্ষণ।... রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'লাঙলে'র জন্যে আশীর্বচন জোগাড় করবার ভার পড়ল আমার উপর। একদিন সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন ঃ

জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।"

'লাঙলে'র প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীর্বচন থাকত।...

কনফারেন্সের জন্যে গান লেখবার ফরমাস করা গেল নজরুলকে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আদায় করলুম আমরা দুটি গান—'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল' আর 'ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধ্বংসের লাঙল'। বাঙলা-সাহিত্যে এই ধরণের গান ছিল না এর আগে, নজরুলই তার পথকার। কৃষ্ণনগর সেদিন মৌচাকের মত মুখর।...নজরুলও সেই মিটিং-এ ছিল, সে বক্তৃতাও দিল, গানও গাইল।

এলবার্ট হলে 'বসন্ত উৎসব' অনুষ্ঠিত হল। নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকার ও আরো অনেকে গান গাইলেন। আমিও ছিলুম সেই গায়কদের মধ্যে।

---

* জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি.-এর নভেম্বর ১৯৭৫ সংস্করণ 'যাত্রী' বই থেকে নেওয়া।

জীবনানন্দ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৭.২.১৮৯৯—২২.১০.১৯৫৪]

'এখনকার ছেলেরা দু'চার ছত্র জীবনানন্দ পড়েই কবি হয়'— জীবনানন্দের সহযাত্রী—কোনো বর্ষীয়ান কবি এই রকম একটি ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেছিলেন বলে শুনেছি। মাত্র জীবনানন্দ পড়েই যে কবিত্ব বিকশিত হবে একথা যেমন সত্য নয়, তেমনি জীবনানন্দের উক্তিটিও স্বীকার্য ঃ 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

তবু—সন্দেহ কী, জর্জীয় আধুনিকতার প্রতিনিধিত্ব যাঁরা বাংলা কাব্যে করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দের মতো প্রভাব তরুণ মনে আর কেউ বিস্তার করতে পারেন নি। কবি হিসেবে কার স্বাক্ষর কতখানি ভাস্বর হয়ে থাকবে—সে-সব বিচার তো নিরাসক্ত নির্লিপ্ত ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আজ—এই কালেই, একদল নবীন কবির কাছে জীবনানন্দ মাত্র ব্যক্তি-কবিই নন্— তিনি একটি ইন্‌স্টিট্যুশন—'সংস্থা'। 'জীবনানন্দের আর এক নাম কবিতা'—এই উচ্চারণও চোখে পড়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অগ্রণী কবিরা স্বমহিমায় অবশ্যই অধিষ্ঠিত থাকবেন, কিন্তু জীবনানন্দ যে আশ্চর্য লোকপ্রিয়তায় উত্তীর্ণ হয়েছেন— তা যে-কোনো কবিরই দুর্লভ সৌভাগ্য।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অতি মূল্যবান বইটি রয়েছে, তার সম্পর্কে পরিপাটি আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু এবং দীপ্তি ত্রিপাঠী, তরুণ অম্বুজ বসুও একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর বই লিখেছেন। বাংলা পত্র-পত্রিকায় আরো বিবিধ সমীক্ষা ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত। জীবনানন্দ বারবার আলোচিত এবং ব্যাখ্যাত হবেন, তাঁর রোমাণ্টিক মনন, আত্মমগ্নতা, বিশিষ্ট ভাষারীতি এবং ছন্দোস্বাতন্ত্র্য, শব্দ-ব্যবহারের নিজত্ব, প্রতীক এবং চিত্র-

কল্পের প্রয়োগ, জীবনবোধের মৌলিক স্তর-ক্রমোন্নয়ন-পরিণতি, এগুলো নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হওয়ার জন্যে আরো অনেক চিন্তা নিয়োজিত হবে—অনেক প্রদীপ্ত ভাষ্যকার আসবেন। জনপ্রিয়তার মূলে কবির কোনো মৌলিক দুর্বলতা আছে কিনা, নিরাবেগ বুদ্ধি তাও নির্ণয় করে দেবে।

জীবনানন্দ যেমন 'রূপসী বাংলা'র তন্ময় প্রেমিক, তেমনি তাঁকে বাংলা দেশও ভালোবেসেছে—আমরা তারই শরীক।...

বৈশাখ ১৩৭৭।

উদয়শঙ্কর বিশ্বনাথ ঘোষ

Simone Barbier উদয়শঙ্করের Simkie, ১৬ বছর মায়ের কাছে পিয়ানো শিখেছেন, এবং Isadora Dun Cun-এর কাছে নাচ শিখেছেন, যাঁকে জর্জ বার্ণাড শ অনেক বলা সত্ত্বেও বিবাহ করেননি, উত্তর দিয়েছিলেন,—আমার মত সুপুরুষ আর তোমার মত ব্রেন কোন সন্তানের হলে, সে নিশ্চয় সুপার ম্যান হবে না, তাই এ বিবাহ নাকচ করলাম।

রুশ মহিলা Anna Pavlova উদয়শঙ্করকে নিয়ে কৃষ্ণের নাচ দেখিয়ে ছিলেন ইংল্যাণ্ডে, তাতেই সমগ্র ইউরোপ হয়েছে মুগ্ধ। উদয়শঙ্কর গিয়েছিলেন লণ্ডনে ছবি আঁকতে।

এরপর দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী গুরু নামবোদ্রিপাদকে গুরু করে হিন্দুদের দেবদেবীর কাহিনী অবলম্বন করে তিনি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত নৃত্য শিল্পগুলির গঠন এবং ফরাসি মহিলা সিমকির সহযোগিতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের নানা রঙের চিন্তাগুলি। দীর্ঘদিন লৌকিক ভাষায় যাকে বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সৃষ্টি।

এর পরে এক অদ্ভুত ঝড়ে আলমোড়ার Udoy Shankar India Culture Centre চলে যায়। মনে পড়ে যায় টালিগঞ্জের অক্ষয় নন্দীর মেয়ে অমলা নন্দীর প্যারিস International Exposition-এর কথা।

আমরা এসবের পর দেখতে পাই উদয় অমলা শঙ্কর পুত্র আনন্দ শঙ্করের প্রতিভার অভাব আর কন্যা মমতা শঙ্করের অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা।

এই ঘটনায় যুক্ত অনেকগুলি প্রতিভার জীবন গভীর দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেগুলি কোন যথার্থ শিল্পীর কাছে নতুন কথা নয়, তবু সিমকির প্রতি উদয় শঙ্করের আচরণ ভারতীয় পুরুষের প্রতিবাদযোগ্য বলে মনে করি। নাহলে উদয় শঙ্কর উদয়পুরের রাজদরবারে বসে দিন কাটালে কিছু বলার ছিল না।

উদয় শঙ্করের জন্ম ৮.১২, ১৯০০ উদয়পুর। মৃত্যু কলকাতায় ২৬.৯.১৯৭৭ সিমকি জন্ম প্যারিস ১৯০৪, মৃত্যুও প্যারিসে ১৯৯২

জয়সলমীরে অপরূপ সোনালী সূর্যাস্ত

১১-১১-৯৭ দীপালী চৌধুরী

বেলা আড়াইটে নাগাদ জয়সলমীর শহর থেকে রাজস্থান পর্যটন দপ্তরের ভাড়া করা জীপে চেপে আমরা পাঁচ বন্ধু চলেছি ৪২ কিঃ মিঃ দূরে জরসলমীরের পৃথিবী-বিখ্যাত সূর্যাস্ত পয়েণ্টে। সরু শহর জয়সলমীর ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত। ভারতের এই অঞ্চলটি থরমরুভূমি অঞ্চল। এখানে সোনালী বালু ও সোনালী পাথরের রাজত্ব। আমাদের জীপের ড্রাইভারজী যেতে যেতে পথে আমাদের দেখালেন জয়সলমীরের রাজপরিবারের সমাধিক্ষেত্রে খুব সুন্দর গঠনশৈলীর সব সমাধিমন্দির সোনালী পাথুরে পাহাড়ের ধাপে

ধাপে। একেবারে উঁচুধাপের সমাধিগুলি নাকি রাজপরিবারের বৌ ও অন্যান্য অত্মীয়াদের সতীদাহের স্মৃতি সৌধ। এই খাঁ, খাঁ ঝরা ভর দুপুরে রাজপরিবারের সমাধিক্ষেত্রে, সোনালী বালির বিশাল বিস্তারের মাঝে মনে কেমন যেন এক বিষন্নতা এনে দিল। মানুষের কত আশা,আকাঙ্ক্ষা, সমৃদ্ধি, পরাক্রম একদিন এইভাবে ধূলায় মিশে যায়।

আমাদের বাহন আবার চলতে লাগলো পিচঢালা মসৃন রাস্তাধরে রাস্তার দুই ধারে আদিগন্ত সোনালী বালির প্রান্তর। মাঝে, মাঝে পথের পাশে বলিষ্ঠ, সজীব বাবলা গাছের সারি। আর রয়েছে প্রান্তর জুড়ে কাঁটা গাছের ঝোপ। আবার কোথাও ছোট ছোট খন্ড জমিতে হালকা তৃণের আস্তরণ। জলবিহীন মরু অঞ্চলে এই গাছপালাও তৃণের দর্শন পাচ্ছি আমাদের বন বিভাগ ও কৃষি বিভাগের প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে। হঠাৎ দৃষ্টি মেলি দিগন্তের শেষ প্রান্তে। যেখানে অসীম, সুনীল আকাশ গিয়ে মিশেছে ঠিক সেখানে যেন দেখি মহাসাগরের নীল অতল জলরাশির অসীম বিস্তার। বাড়ী নেই, ঘর নেই, মানুষ নেই, জনপদ নেই। বিশাল মরুপ্রান্তরে সাগরের নীল জলরাশির কথা আগে তো শুনিনি কোন দিন কারো কাছে!

ড্রাইভারজীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এই জলের-ভ্রমই হল মরুভূমিতে মরীচিকার হাতছানি। আমরা খুশী হয়ে বললাম যাক্, তাহলে থরমরু অঞ্চলে মরীচিকার দর্শনও পেলাম আমরা। এই "মরীচিকা" শব্দটি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে আমরা কথায়, কথায় ব্যবহার করে থাকি।

আমাদের বাহন এবার জয়সলমীরের বিখ্যাত জৈন তীর্থ অমর সাগরের দ্বারে এসে থামল। সোনালী পাথর ও বালির বিশাল এলাকার মাঝে অদ্ভুত সুন্দর একটি সোনালী পাথরের কারুকার্যময় জৈন মন্দির চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের

গর্ভগৃহে একজন জৈন তীর্থঙ্করের শ্বেতপাথরের মূর্তি রয়েছে। কোন জলের চিহ্ন নেই এখানে। তবে অমর সাগর নাম হল কেন? এইটিও কি তাহলে মরীচিকার আংশিক ভ্রম? জিজ্ঞাসা করতেই ড্রাইভারজি বললেন, শুধু বর্ষাকালেই এই বিশাল এলাকা জলের তলায় ডুবে যায়। এলাকাটিকে তখন সাগরের মতই দেখায়। মন্দিরটিকে তখন ভাসমান সুদৃশ্য জাহাজের মত দেখতে লাগে। তখন সাগরের জলে দলে, দলে জৈন তীর্থযাত্রী স্নান করে এই মন্দিরে ভক্তিভরে পূজা দেন। অমর সাগরে ছোট্ট একটি জনপদে রাজস্থানীদের প্রধানত মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের গ্রামীন জীবন যাত্রার দেখা পেলাম। উটের পিঠে বিরাট বোঝা সমেত উটদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। এইসব অঞ্চলে উটই একমাত্র বাহন এবং অমূল্য সম্পদ। যার যত উট বেশি আছে সে তত ধনী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়। দেখে বোঝা যায় গ্রামবাসীরা বেশির ভাগই দরিদ্র। কিন্তু সবাই বিশেষত মেয়েরা সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিতা। পাথরের ও পুতীর গয়নাও তারা পরেছে। বিচিত্র রঙের ঘাগরা ও চোলী পরা রাজস্থানী কিশোরী ও মহিলাদের খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। মহিলা ও পুরুষ সবার গড়ন ছিপছিপে ও কর্মঠ। মুখের ভাব সজীব ও সপ্রতিভ। এক কথায় দেখতে এরা সুন্দর।

রাজস্থানের মরু অঞ্চলে মেদবহুল মানুষ চোখেই পড়ে না। রাজস্থানীরা বিশেষত মরু অঞ্চলের মানুষরা খুব রঙ চঙে, ঝলমলে পোশাকের ভক্ত। নিজেদের দেশের ধূসর মরু অঞ্চলের এক ঘেয়ে রঙই বোধ হয় এদের মনে বিচিত্র রঙের প্রতি এতো আকৃতি জাগিয়েছে। আদিগন্ত বালুকারাশির মধ্যে না আছে কাছাকাছি জল, না আছে কোন ফসল ফলাবার সুযোগ। জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিসই ওদের নিজেদের অঞ্চলের বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তাই সব জিনিসেরই আকাশ

ছোঁয়া দাম। এক কথায় গ্রামবাসীদের জীবন যাপন এখানে কঠিন জীবন সংগ্রাম। এরা বিলাসবাহুল শহুরে জীবনের সন্ধান পায় নি বলেই এই কঠিন জীবনকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়ে বেশ আনন্দেই আছে। এরা গান বাজনার খুব ভক্ত। বাঁশি, বীণ ও একটা তবলার মত বাজনা নিয়ে পথে ঘাটে লোকসংগীত গেয়ে গেয়ে বেড়াতে এদের আমি দেখেছি। মনে সুর ও ছন্দ থাকলে খুব সাধারণ সরল জীবনও সহনীয় হয়ে ওঠে।

অমর সাগরের পর এবার আমরা চলেছি জয়সলমীরের প্রাচীন রাজধানী লোদুর্ভার পথে। জয়সলমীর থেকে ১৬ কিঃ মিঃ দূরে। এককালের ঝলমলে রাজধানী লোদুর্ভা এখন একটি সাধারণ ছোট্ট পল্লীগ্রাম। একটি প্রাচীন সুন্দর জৈন মন্দির শুধু আছে এখানে। জৈন মন্দিরের ভিতর অদ্ভুত সুন্দর কষ্টিপাথরে তৈরি কালো কুঁচকুচে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে। অদ্ভুত সুন্দর মুখের ভাব এই মূর্তিটির।জয়সলমীরে কোন মন্দিরে এর আগে কষ্টিপাথরের মূর্ত্তি দেখি নি। সব মিলিয়ে সাদাসিধে অথচ সপ্রতিভ মানুষজন ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীন রাজধানী লোদুর্ভা শান্ত মেজাজের একটি ছোট্ট জনপদ। লোদুর্ভার দুর্গ, রাজবাড়ী ইত্যাদি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জয়সলমীরের সান-সেট-পয়েন্ট

লোদুর্ভা দর্শনান্তে আমরা চলেছি "এবার আজকের প্রধান আকর্ষণ, জয়সলমীরের" সান-সেট-পয়েন্টে। আগেই বলেছি জয়সলমীর শহর থেকে এই পয়েন্টটি ৪২ কিঃ মিঃ দূরে। প্রাচীন রাজধানী লোদুর্ভাকে পিছনে ফেলে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি জনমানবহীন দিগন্ত প্রসারিত সোনালী বালির মরু অঞ্চলকে পথের দুইপাশে রেখে। আবার সেই নীল জলরাশি দিগন্তের শেষ প্রান্তে। অর্থাৎ মরীচিকার নিষ্ঠুর হাতছানি সব মিলিয়ে

দারুণ দুঃসাহসিক ও থ্রিলিং এই পথটি। থর মরুভূমির সান-সেট পয়েন্টের দিকে যত এগোচ্ছি ততই উড়ন্ত সোনালী বালির প্রান্তরের দেখা পাচ্ছি। বালির মাঝে আকন্দ গাছে বড় বড় আকন্দ ফুল ফুটে আছে। এরপর শুরু হল সোনালী বালি পাহাড়ের ঢেউ স্তরে স্তরে যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত। বালির পাহাড় মানে স্তরে, স্তরে বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ির দৃশ্য যে এতো দৃষ্টিনন্দন হয় এর আগে জানা ছিল না। আমাদের গাড়ি বালিয়াড়ির ঢেউয়ের পাদদেশে এসে থেমে গেল। এখানে প্রান্তরে উটের মেলা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উটচালকরা। সুসজ্জিত উটেরা সব নির্বিকার ভাবে গলা লম্বা করে বিরস বদনে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীদের অপেক্ষায়। প্রচুর স্থানীয়, দেশী, বিদেশী যাত্রীদের সমাবেশ হয়েছে এখানে।

সবাই সূর্যাস্ত পয়েন্টে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। এই দৃশ্য দেখে আমার কেদারনাথ যাত্রার কথা মনে পড়ে গেল। কেদারের পথে গৌরীকুণ্ডে ঘোড়াদের প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে থাকে ঘোড়াওয়ালারা কেদারনাথের যাত্রীদের অপেক্ষায়। মরু অঞ্চলে উট আর পাহাড়ী অঞ্চলে ঘোড়া হল প্রধান বাহন। আমাদের ড্রাইভারজী আমাদের জন্য উটের ব্যবস্থা করতে লাগলেন উটওয়ালাদের সঙ্গে দরাদরি করে। সান-সেট পয়েন্ট এখান থেকে দেড় দুই কিঃ মিঃ পথ হবে। আমাদের ছোট্ট তিন বান্ধবী উটের পিঠে ওঠার জন্য খুব উৎসাহী। বান্ধবী নমিতাদি আর আমি উটের চেহারা ছবি বসা ওঠা দেখে একদমই উৎসাহিত হলাম না উটের পিঠে উঠতে। এদিকে বেলা চারটে বেজে যাচ্ছে। এখন রওনা না হলে সূর্যাস্তের পুরো দৃশ্য দেখতে পাব না। কত জায়গায় নদীর পাড়ে, সমুদ্রে, পাহাড়ে, ড্যামের ধারে, ধানক্ষেতের পাশে সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়েছি কিন্তু মরুভূমির বালিয়াড়ীতে সূর্যাস্ত কেমন হবে কে জানে। আর দেরী নয়। ঠিক হল আমাদের তিন ছোট্ট বন্ধু

উটের পিঠে চেপে যাবে। আর বান্ধবী নমিতাদি আর আমি যাব পায়ে হেঁটে সোনালী বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে সান সেট পয়েন্টে। উটের যাত্রীদের ও স্থানীয় রাজস্থানী মানুষদের মিছিলের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমরা দুই বন্ধু হাঁটতে শুরু করে দিলাম। বহু বিদেশী পর্যটকও আমাদের পাশে উটের পিঠে চেপে চলেছেন। সোনালী বালিয়াড়ীতে পায়ের গভীর চিহ্ন রেখে, রেখে আমরা হাঁটছি মহানন্দে। যতদূর দৃষ্টি মেলি দিগন্ত প্রসারিত সোনালী কোমল বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি।

আমাদের পদযাত্রীদের মিছিলে স্থানীয় রাজস্থানী গাইয়ে ও বাজিয়ে শিল্পীরা চলেছেন বীণের ও বাঁশির সুরে গলা মিলিয়ে লোকসঙ্গীত গাইতে গাইতে রাজস্থানে বিশেষত বিকানীরে ও জয়সলমীরে এই লোকসঙ্গীত শিল্পীদের দেখা পথে ঘাটে মাঝে মাঝেই পেয়েছি। থর মরুভূমির উদার, সৌম্যপ্রকৃতি, যেখানে বাড়ী নেই, ঘর নেই, কোন লোকালয় নেই, জলের কোন চিহ্ন নেই, শুধু স্তরে স্তরে সোনালী রঙের বালিয়াড়ির ঢেউ যতদূর দৃষ্টি মেলি। এ যেন মনে হয় আদিম পৃথিবীর আর এক রূপ! আমরা ব্যস্ত মানুষ সেই বিশালত্বে অসহায়। ক্ষুদ্র প্রাণী ছাড়া আর কিছু নই। বিশাল এক চকচকে সোনালী বালুর ঢেউ-এর মধ্যে আমরা হেঁটেই চলেছি পৃথিবীর বুকে পথিকের মত। আমাদের পাশে, পাশে উটওয়ালারা যারা যাত্রী পায় নি, অনুরোধ জানাচ্ছে আমাদের উটের পিঠে উঠতে। আমরা রাজি না হলে বলছে সাবধান, এখানে কিন্তু চোরাবালি আছে।

আমরা ওদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি। চলতে, চলতে হঠাৎ ঠিক সামনের বালিয়াড়ির শীর্ষে একটি সাইন বোর্ডে লেখা আছে দেখলাম "সান-সেট-পয়েন্ট"। আমরা সোনালী বালিয়াড়ির শীর্ষে এসে জায়গা বেছে নিয়ে চুপ করে বসে পড়লাম। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আছি একমনে। সঙ্গীদের

দেখা নেই। ওরা বোধ হয় আমাদের অনেক পরে রওনা হয়েছে উটের পিঠে চেপে। পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি মেলি আদিগন্ত বালিয়াড়ির ঢেউ। মাথার ওপর সুনীল আকাশের ঢাকনা দিগন্তে বালিয়াড়িতে গিয়ে মিলেছে। অসাধারণ এই দৃশ্য। হঠাৎ দিগন্ত রেখায় হালকা কমলা রঙের আভা। বালিয়াড়ীর পাদদেশে উটের পিঠের যাত্রীদের হৈ, চৈ। দেশী, বিদেশী, স্থানীয় সব রকমের যাত্রীরা রয়েছে এই ভীড়ে। আমাদের বন্ধুরা ভীড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে বলছে,—আমাদের উটের পিঠে বসা একটি ছবি নাও। চট করে ওদের একটা ছবি তুলে নিলাম অস্ত সূর্যের কোমল কমলা আভায়। ক্রমশ অপার্থিব কমলা আলোয় সূর্য-দেবকে দেখা যাচ্ছে একটু একটু করে মাথা তুলছেন দিগন্তে সোনালী বালিয়াড়ির ঢেউ এর পিছনে।

নীল আকাশে ক্রমশ উজ্জ্বল আবীর রঙের খেলা শুরু হল। থর মরুভূমির গোটা স্যাম স্যান্ড ডিউনসের জগতে কোন রসিক-জন যেন হোলি খেলার লাল আবীর রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ধরণের অপার্থিব আলোর খেলায় যে রোম্যান্টিক জগতের সৃষ্টি হয়েছে তাতে মন যেন অকারণ আনন্দে নেচে ওঠে। সূর্যদেব উজ্জ্বল সোনালী এক গ্লোবের মত আবীর ঢালা সুনীল আকাশে ধীরে, ধীরে উদয় হল অস্তে যাবার জন্য। সোনালী বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে এসে পেছনের সারির একটি বালিয়াড়ির শীর্ষে যেন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে চুপটি করে বসলেন সূর্যদেব। আবীর ঢালা বালিয়াড়ির ঢেউএর অসীম বিস্তারের মাঝে সোনালী অস্তসূর্য আর সোনালী বালি যেন একাকার। সূর্যদেব বালির মাঝে খেলতে, খেলতে হঠাৎ টুপ্ করে বালিয়াড়ির পিছনে ডুব দিলেন।

এদিকে রাজস্থানী লোকসঙ্গীত-শিল্পীরা তাঁদের বীণ আর বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন লোকসঙ্গীতের মিষ্টি সুরের নিখুঁত ছন্দে

ও লয়ে। মানুষ আর প্রকৃতির এমন অপূর্ব ঐক্যতান জীবনে বড় দুর্লভ বস্তু। এ শুধু অনুভবের জিনিস। আমার সব মিলিয়ে মনে হতে লাগলো এমন সোনালী, অপরূপ, সুরেলা, সুন্দর, গোধূলির দেখা আবার কবে, কোন্ দিন পাব কি জানি!

জীবনানন্দের ঘোড়া লৌভিক জানা

Myths are expressions of community mind which has enjoyed long natural growth. So that the sense of togetherness becomes patterned and commentically significant. Myth is an expression of whole experiences that whole men have known and felt. —Philip Wheelwright.

জীবনান্দের 'ঘোড়া' সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বলার আছে। ঘোড়াও টোটেম সমাজের প্রাণী এক সময় ছিল: মিসিসিপির তীরবর্তী শাওনী গোষ্ঠীতো গোত্র হিসাবে ঘোড়া বিদ্যমান ছিল (গে-সা-ওয়া)। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে ঘোড়ার ছায়া প্রথম অপ্রত্যক্ষে দেখা গেছে 'ক্যাম্পে' কবিতার ঘাই হরিণীর সূত্রে। কবিতার অন্বয়ে বিবৃত হতে দেখা যায় 'স্থবির যৌবন' কবিতায়, যেখানে বাঘের বিক্ষোভ হরিনীকে নদীকিনারায় নিয়ে গেছে রাতে, তারপরই নারীকে কঙ্কালের হাতে সঁপে দিয়ে প্রেমিকার জন্য হাজির হয়েছে কুয়াশার ঘোড়া। সে ঘোড়া যেন কোন অতিন্দ্রীয় স্বপ্নরাজ্যে ঘোরাফেরা করে। কবি বলেছেন: বিকালের জাফরান দেশে নদীকিনারায় চরতে দেখি সেই ধূসর কুয়াশা-ঘোড়া। জাফরান দেশ বলে কোন ভৌগোলিক দেশ আছে বলে জানা নেই। অতীতে খুব সম্ভবত ছিল না।

তবে কি সে ঘোড়া ছিল জাফরান রঙের দেশে ঘোড়া। সে ঘোড়াকে সশরীরে দেখা গেছে 'মহাপৃথিবী'র পর্ব থেকে।

১. 'কে যেন উঠিল হেঁচে—হামিদের মারকুটে কানা ঘোড়া বুঝি' (নিরালোক)

২. 'মরখুটে ঘোড়া ওই ঘাস খায়...' (পরিচারক)

জীবনানন্দের ঘোড়া অতীতচারী, তার উপর চড়েই যেন জীবনানন্দের ইতিহাস পরিক্রমা সফল হয়েছে।

১. যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি

অতীত—ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব...হামিদের মহীনের গাড়িটানা সব ঘোড়া জ্যোৎস্নার অলৌকিক লেগে প্রস্তর-যুগের সব ঘোড়া হয়ে উঠলে অতীত-ঋষিদের যুগ থেকে আরও দূরে যেতে হয় প্রত্ন—Primitive সাংস্কারে। প্রাক্‌পুরানিক প্রতীক ঘোড়ার পরিচয় লিখেছেন য়ুং:

'Horse' is an archetype that is widely current in mythology and folk-lore. As an animal it represent the nonhuman psyche, the sub-human animal side, and therefore the unconcious. This is why the horse in folk-lore sometimes sees visions, hears voices, and speaks. As S best of burden it is closely related to the mother-archetype; the Valkyries bear the dead hero to valhalla and the Trojan horse encloses the Greeks. As an animal lower than man it represents the lower part of the body and the animal drives that take their rise from there. The horse is dynamic power and a means of location; it carries one away like a surge of instinct. It is subject to panics like all instinctive creatures who lack higher conciousness. Also it has

to do with sorcery and magical spells—'specially the black, night hourse which heralds death'.

অতীত ঋষিদের কাছে ঘোড়া যা ছিল তা হল এইরূপ :—এক সময় রুক্ষ সাজ পরানো সাদা ঘোড়া অগ্নি বা সূর্যের প্রতিরূপ (রূপম) প্রজাপতিরও সে প্রতিরূপ, এবং সঞ্চারকারী প্রাজাপত্য যজ্ঞাশ্ব পাখিরূপ ধরে যজ্ঞকারীকে বহন করে নিয়ে স্বর্গে যাবার কথা, তিষ্ঠত অশ্বকে তৃণার্ঘ্য দিয়ে আমরা হবন করি অগ্নিকে ; অশ্বায়েব তিষ্ঠন্তে সামমস্মৈ...নভা পৃথিব্যা সমিধানমগ্নিম্...হ বামহে'...'জীবনানন্দের আগুনের নাল পরানো বাতাসঘোড়া' জলের নাল পরানো আগুনঘোড়া এসেছে এই উৎস থেকে।

"আরো এই ঘোড়ার প্রাচ্য সংস্কার। চীনা শিল্পশাস্ত্রে ঘোড়া হল আকাশ প্রতীক, তার ছন্দিত কদমে উড়ে চলা নক্ষত্রের গতি। ফরাসী মসনবিতে পাই তুর্কোমানের ঘোড়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আগুনে, সেখান থেকে আগুনরূপ ধরে লাফ দিয়ে উঠল আকাশের চূড়োয়। ঘোড়া এদেশে পক্ষীরাজের রূপকথা বটে, ব্যাঞ্জনাময় ও বটে আরো। পৃথিবীকে নিত্য টানছে মহাপৃথিবীর দিকে, লোকাতীতের সঙ্গে লোকায়তের সহজ এবং রহস্যময় সম্বন্ধের সে বাহন। আর আধুনিক কবির লেখায় সে উঠে এসেছে—কেবল উধৃত হয়ে নয়, আছে—আবহকাল ধরে আছে কোথাও, এবং থাকবে, এই প্রত্যয় হয়ে

১, এই স্থান, হ্রদ আর, বরফের মত শাদা ঘোড়াদের তরে
ছিল তবু একদিন ? রবে তবু একদিন ?
(পরিচারক)

২, সেই সব শাদা-শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন্ জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করেছে কোথাও···
(আজকের এই মুহূর্তে)

'সাতটি তারার তিমির'-এ গোল আস্তাবলের ঘেরাটোপে ক্ষণ-রাত্রির প্যারাশিন লণ্ঠনটুকু নিবে গেছে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে—সেই নিরন্ধ্র সময়, কোন কালবিক্ষেপের ছাপ পড়ে না যার মুখে, এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ স্তব্ধতার জ্যোৎস্না ছুঁয়ে সময় সমকাল থেকে বিস্তার হয়ে গেলে গণ্ডি দাগ প্রত্যাহার করে, নিমিষের মধ্যে আমরা হয়ে উঠেছি একই কালে একালের ও চিরকালের।"

এখানে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায়—কিভাবে জীবনানন্দীয় ঘোড়া সমকালের, একালের হয়েও চিরকালের হয়ে উঠছে তার ব্যাখ্যা নেই। সেই ব্যাখ্যার সুন্দর হৃদয়গ্রাহী প্রয়াস পাওয়া গেল অলোকরঞ্জন দাসগুপ্তের আলোচনায় যার সঙ্গে একমত হতেই হয়। তাঁরই ব্যাখ্যা হুবহু তুলে দেওয়া গেল।

প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে
চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনাসোর 'পরে।
অস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভীড় রাত্রির হাওয়ায়।
(ঘোড়া)

এটুকু পড়লেই অনুষঙ্গে জেগে ওঠে সালভাদর ডালির অতি-পরিচিত ছবি 'অটোমোবাইলের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেওয়া একটি অন্ধ ঘোড়া টেলিফোন চিবিয়ে খাচ্ছে' (১৯৩৮)। ছবিটির চিত্রণকাল 'সাতটি তারার তিমির' রচনাকালের আগেই নিবদ্ধ, কিন্তু ঐ কালপর্বেই বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এরকম খাপছাড়া নামকরণের মধ্যে চমকপ্রদ জৌলুস একটু অতিরিক্ত পরিমানে উপস্থিত, একথা মেনে নিয়েও ঐ আলেখ্যের প্রাসঙ্গীকতা তখন কোন চিত্রসমালোচকই অস্বীকার করতে পারেন নি। নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে জীব-চেতনার সংঘর্ষ এই প্রথম আধুনিক শিল্পায়নে এরকম তীব্র চেহারা নিল। যন্ত্রজাত ঘোড়া যন্ত্রকে লোপাট করে

দিয়ে ফিরে যেতে চাইছে প্রাগৈতিহাসিক পরানিসর্গে, টেলিফোন-টাকে নির্মূল করে ফেলেও তার ক্ষান্তি নেই, বিদ্যুতের বাল্বটাকে বিপুল আক্রোশে লুপ্ত করে দেবার জন্য ঘাড় বাঁকিয়েছে আর তার ঐ সংগ্রামী ভঙ্গিকে সমর্থন করে পটভূমির মতো তাকিয়ে আছে রাত্রি ও চন্দ্রকলা মহীনের ঘোড়াগুলিও কি যন্ত্রসভ্যতার কবল থেকে প্রাণপণে নির্মুক্ত হবার জন্য এই নূতন 'দৃশ্যের জন্ম' সূচীত করে দিচ্ছে না? মহীনের সঙ্গে পাঠকের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও তার নামের প্রতাপ থেকে আভাসিত হয় তার ধনিক প্রকৃতি। এখানে এতদূর বললেও অসঙ্গত হবে না ধনবাদী কর্তৃকারকের একচেটিয়া প্রভুত্ব থেকে ছিটকে গিয়েই অধিকৃত ঘোড়াগুলোর 'জ্যোৎস্নার প্রান্তরে' ঐ মুক্তিচর্যা। এর পরই আমরা দেখতে পাই প্রাণী জগতের মুক্তিস্পৃহার প্রস্তুতিঃ 'আস্তাবলের ঘ্রাণ' আর 'ইস্পাতের কলে' ঝরে পড়া বিষণ্ণের খড়ের শব্দ'। বৈষম্যের ভিতর থেকে ফুটে ওঠে চা'য়ের পেয়ালা ক'টা বেড়াল ছানার মতো', যার প্রকৃত প্রস্তাবে বিষম উপায়ে ন্যস্ত হয়েছে, অর্থাৎ কয়েকটা বেড়াল ছানাই এখানে চায়ের পেয়ালা মতো সন্নিবিষ্ট, যারা উপভোক্তা মানুষের স্পষ্ট কর্তৃত্ব কোনোক্রমে এড়াতে পারলেও ঘুমে ঘেয়ো 'কুকুরের অস্পষ্ট কবলে' পড়ে বেশীদূর যেতে পারে না, তাদের সন্ত্রস্ত পলায়ন ও পাশের 'পাইস-রেস্তরাঁ'তে অবাসিত হয়ে পড়ে। হয়তো কানাগোলির সেই অধ্যুষিত আবহাওয়া থেকে তারা ত্রাণ পেয়ে যেতে পারে, এই ধরণের বোধেই প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে যায়, আস্তাবলটি মহীনের আগারে আবদ্ধ না থেকে বিস্তৃত হয়ে যায়, 'নিওলিথ—স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' বিরাজ করে 'সময় প্রশান্তি'। নাগরিক ও অরণ্য সভ্যতার সংঘাত নব্যপ্রস্তর যুগের সমাধা পায়, সেটা মনে হয়, কবির রফানিষ্পত্তি।" এরপরও বোধহয় আরও এক স্টেপ এগোবার জায়গা থাকে। কেননা প্রশ্ন আসবেই এই রফানিষ্পত্তির

মূলে হঠাৎ ঘোড়াকেই হাজির করা হল কেন? কেন অন্য কোন আদিকল্প উঠে এলো না? আসলে তেমনি কোন দুর্গম ও অস্বস্তিকর বা ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে ঘোড়াই পারে একমাত্র Communication ঘটাতে; আর যে কোন Communication এর মূলেই তো আছে গতি। এই গতির সঞ্চারের অবতারণায় জীবনানন্দের ঘোড়া, যা মহাপরিনির্বাণের সার্থকতায় উদ্বেল, লোকায়ত জগৎ ভেঙে লোকত্তরিত, যা নির্মান ও প্রতিনির্মানের বিমুগ্ধতায় যখন তখন কুয়াশার ঘোড়া, মরখুটে ঘোড়া, মারকুটে কানা ঘোড়া, অতীতচারী ঘোড়া ও অবশেষে মহিনের ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে দেখি। এই যে Communication to গতি, গতি to form, from to force ক্রমে প্রতিভাস রচনা হতে দেখি তা জীবনানন্দীয় ঘোড়ার উপর কোন বিশেষ এবং বিচ্ছিন্ন অর্থে আরোপিত হতে পারে না। সব ধরনের ঘোড়াগুলি মিলে পাঠকের মনে পুরাণ আদিকল্পের এক নূতন মডেল উপস্থাপিত করে যে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরে হয়তো আওয়াজ নেই তাই সে নিওলিথ স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে যায়—কোন রোমাণ্টিক আবেশে নয়—এক বৈশিষ্ট্যময় দৃঢ় প্রত্যয়ে। আর এখানেই জীবনানন্দীয় ঘোড়ার অনন্যতা।

ত্রিস্তরীয় ভাষা

বিউটি মজুমদার

আপন আপন মাতৃভাষার সংরক্ষণ সম্প্রসারণ এবং উন্নতি বিধানের জন্য প্রায় সকলেই মানে সকল ভাষাভাষীরা চিন্তাগ্রস্ত হলেও সমানভাবে সচেষ্ট বা তৎপর নয়। বিপরীত প্রেক্ষায় আবার কোন কোন ভাষাসম্প্রদায় এ বিষয়ে একটু বেশীরকমই উৎসাহী এমন কি ভাষাভিত্তিক অঞ্চল প্রদেশ বা রাজ্য গড়ে তুলতে

রীতিমত তৎপর। সে তৎপরতা সক্রিয় আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে যা কখনো হিংসাত্মকও হয়ে পড়ছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যে-ভাষা অন্য ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারত, সাংস্কৃতিক লেনদেনের আধার হতে পারত,—পারত আত্মীয়বন্ধন-সূত্র হতে, তা ক্রমে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিভেদের প্রাচীর, অপরিচয়ের অন্তরাল, বিচ্ছিন্নতার কাঁটাতার। এর ওপরে রাজনৈতিক কুটচালে কিংবা আখের গোছাবার মতলবে মদৎপুষ্ট হচ্ছে এইসব বিচ্ছিন্নতা-বাদ—যা অচিরেই ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করে ফেলে এই উপমহাদেশকে করে ফেলবে শতধা। এই দেশেই মহামতি সম্রাট আকবর এবং ছত্রপতি শিবাজী একই স্বপ্ন দেখেছিলেন, এক ধর্ম রাজ্যপাশে ছিন্নভিন্ন ক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে দেবার, একতা-পাশে সুসংবদ্ধ করার। বলা বাহুল্য সে ধর্ম মানবতার, সে ধর্ম সৌভ্রাতৃত্বের, সে ধর্ম মহান ভারতীয়ত্বের। সে ধর্মের অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা অনেক ব্যাপক, উদার ও মর্মস্পর্শী। আপাতভাবে সাধারণ অর্থে তা আচরণ সর্বস্ব মনে হলেও নিশ্চিতার্থে তা অন্তরশায়ী মানবিক চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেশবিভাগের সময় ধর্মকে ভিত্তি করেই বিভাজনকে মেনে নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। বছর পাঁচেক বাদে সংবিধান চালু করেছিলেন। সেখানে সঠিক মাত্রায় সকলের জন্যে একই রকম আইন কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়নি। যাকে বলা যায় গোড়ায় গলদ বা সরষেতে ভূত। আইনকে হতে হয় অন্ধ আর সংবিধানকে সমদর্শী। সংবিধানের ক্ষমতা যারা মেনে নেবেন তারাই হবেন ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক—তা তারা যে কোন ধর্ম বিশ্বাসী হোন না কেন। নারাজ হলে খোলা তো রইল অন্য পথ—সে পথ অনিবার্য। ভাবার বেলাতেও তা-ই। রাষ্ট্রভাষা বলে যাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে তাকে মান্যতা দিতে হবে সকলকেই, রপ্ত করতে হবে,

মর্যাদা দিতে হবে মাতৃভাষার মতই! আজ আমাদের কারোরই অজানা নেই যে ধর্ম-কে ভারত ব্যবচ্ছেদের শাণিত ছুরি হিসেবে ব্যবহার করায় স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত মুহূর্ত থেকে কী পরিমাণ রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল প্রত্যন্ত জায়গাগুলিতে এবং ঐ হানাহানির মধ্যেও কত চোখের জল ঝরেছিল ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি হবার দুরপনেয় দুঃখে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই করেছিল তারা মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ধর্ম নামক আচরণ সর্বস্ব এক পরি-ভাষার দুরন্ত শঙ্কায়। নিহিতার্থ নিহিতই রয়ে গেল সত্য ধর্মের জঠরে। ভাষার বেলাতেও কম তর্ক বিতর্কের ঝড় ওঠেনি, কিংবা কম দ্বন্দ্ববিরোধ। পরে কিছুটা নিষ্পত্তি বিধানে ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে ত্রিস্তরীয় ভাষা নীতি গ্রহণ করা হয়। সেই তিনটি ভাষা হল—রাষ্ট্রভাষা-হিন্দী, সহকারী ভাষা-ইংরেজী এবং তৃতীয় হল—মাতৃভাষা।

আজকাল আমরা বাঙালিরা অনেকেই মাতৃভাষার অনগ্রসরতা, প্রচারদৈন্য, অবনয়ন এবং এর প্রতি অনীহা নিয়ে বড় চিন্তাব্যাকুল। এ বিষয়ে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে ত্রিস্তরীয় ভাষা নীতি চালু হলেই বুঝি মুস্কিল আসান। ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয় ত্রিস্তর-ভাষা নীতির অবিলম্বে সংশোধন বা পরিমার্জন হওয়া দরকার। কারণ যাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাদের বেলায় তো শিক্ষণীয় ভাষা পাঠ্যক্রম হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাত্র দুটি—মাতৃভাষা কথান্তরে রাষ্ট্রভাষা-হিন্দী এবং সহকারী ভাষা ইংরেজী। অহিন্দীভাষীদের যদি তিনটি ভাষা শিখতে হয় তবে হিন্দীভাষী-দের ক্ষেত্রেও তিনটি ভাষাই শিক্ষণীয় হওয়া উচিৎ। সেটা হবে ঐচ্ছিক কিন্তু অনিবার্যভাবে আবশ্যিক। অর্থাৎ কিনা, তৃতীয় একটি ভাষা শিখতেই হবে, তবে তা আপন পছন্দ মাফিক কথান্তরে ঐচ্ছিক। তা না হলে অহিন্দীভাষীদের উপর শিক্ষার ভার হবে

তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশী। আরেকটি উৎকট সমস্যা বা অসুবিধে হল, রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দরুণ হিন্দী যে পরিমাণে পোষণ ও প্রোৎসাহন পাবে অন্যান্য ভাষাগুলি আপেক্ষিকভাবে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যদিও একটি সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শবান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সকল ভাষার সমান পোষকতাও সমদৃষ্টি-ভঙ্গির প্রত্যাশা একান্তই স্বাভাবিক। এবং তা উচিৎ ও বটে। কিন্তু আজকাল উচিৎ ব্যাপারটা কতটা ঘটে? তবে এ ব্যাপারে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকেই দোষারোপ করলে চলবেনা নিজ নিজ রাজ্য সরকারকেও আপন গুরুত্বপূর্ণ বিরাট দায় সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনে তৎপর হতে হবে।

অন্য রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে আমাদের নিজ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসা যাক। এ রাজ্যে দু তরফের ভূমিকাই নৈরাশ্যজনক, অর্থাৎ সরকার ও জনসাধারণ—অবশ্য বঙ্গভাষী জনসাধারণ। আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা—যা বিশ্বের দরবারে মহিমময় আসনে সমাসীন—সেই গৌরবদীপ্ত ঋদ্ধ বাংলাভাষা পূর্ণ মর্যাদা পেলনা চাকরি বাকরি বা সরকারী ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিনা রাজ্যস্তরে। আর এদিকে আমরা বাংলাভাষীরা নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে যারপর নাই উদাসীন। অধিকাংশক্ষেত্রে সভা সমিতির আমন্ত্রণ পত্র, অনুষ্ঠান সূচি ইত্যাদি ইংরেজী ভাষাতেই লেখা হয়ে থাকে এখানে; এবং 'ইনভিটেশান কার্ড', প্রোগ্রাম' এ রকম নামাঙ্কনই করে থাকি তার। আগে আমাদের ছোটবেলার কোন শব্দের মানে জানতে চাইলে বড়রা বাংলায় অর্থ বোঝাতেন। আর এখন বেশীরভাগ বাচ্চাদের মানে বোঝাতে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন নাকি সেকালে 'তুরঙ্গ' বলতে কি বোঝায় জানতে চাইলে বলতেন, ঘোড়া বা অশ্ব। আর ইংরেজীতে তাকে কি বলে জানতে চাইলে তবেই তাঁরা বলতেন—হর্স। কিন্তু এখন অশ্ব, ঘোটক এসব মানে চলেনা; বলতে হয় হর্স, তবেই বাচ্চারা

বুঝতে পারে। তেমনি বৃক্ষ মানে ট্রী। এই রকম আর কি। পঁয়ত্রিশ মানে থার্টি ফাইভ। এর কারণ আর কিছু নয়—আমাদের এখানে উচ্চবিত্ত তো বটেই, মধ্যবিত্ত পরিবারের ৭০ শতাংশ ছেলে মেয়ে বোধহয় পড়াশোনা শুরু করে ইংলিশ মিডিয়ামে। অতি সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে—২৫।৩০ শতাংশ নিম্নবিত্তের ছেলে মেয়েরা—বিশেষ করে ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করছে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ঘরে বাইরে আমরা কথাবার্তা বলি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে। ইচ্ছে করে বলি তাইবা বলব কেমন করে? সঠিক বাংলা শব্দ ব্যবহারের অভাবে কিংবা বলা চলে অনভ্যাসের ফলে চটজলদি বাংলা শব্দের জোগান আমরা খুঁজে পাইনা। আর টি, ভি তে যে সব বিজ্ঞাপন বাংলায় প্রচারিত হয় তার সংলাপ কিন্তু প্রায়শঃ সবটাই ইংরেজীতে। যেমন গ্লুকন ডি—বাচ্চারা এটা দেখতে ভালোবাসে! দেখা যায় বাবা কাজের জায়গা থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে—পাপা, কাম অন্ সুইমিং। বাবা মাথা ঝেঁকে 'নো প্লীজ' বলে আপত্তি জানালে ছেলে বলে—য়ু প্রমিস্ড। ছেলের মা-ও জনান্তিক বলেন য়ু প্রমিস্ড।

এমনকি দূরদর্শন-প্রচারিত হিন্দী সংবাদের শব্দ চয়নের সিংহভাগ জায়গা ধীরে ধীরে জুড়ে নিতে বসেছে উর্দু শব্দ। এই সব ঘটনাক্রমের মধ্যে কিছু বিপদের সঙ্কেত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আপন আপন মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও মমতা কমে যাওয়া মানে প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে শেকড় আলগা হয়ে যাওয়া। ভাষা এক একটি ভাষাগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিবাহী পরিচয়লিপি। সেই লিপি মুছে যাওয়া বা অবছা হয়ে যাওয়া মানে অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠা। রবীন্দ্রনাথের মতে "ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈবিক প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে

মানুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।" হিন্দী যে অতি দ্রুত কোনঠাসা হয়ে পড়ছে সে সম্পর্কে হিন্দীবলয় বোধহয় তেমনভাবে অবহিত নয় অথবা সেই একই দশা—মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধের অভাব।

একথা ঠিক মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীকেই চেয়েছিলেন তবে তা সরলীকরণ ও রূপান্তরণ সাপেক্ষে এবং তার নামকরণও করেছিলেন 'হিন্দুস্তানী' বলে। আর সেই ভাষাতে তিনি হিন্দী ও উর্দুর আধাআধি সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন।

"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতমরূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"—রবীন্দ্রনাথ।

আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী সংস্কৃতির ঐক্য সংহতির যোগ-ধারা কোন ভোজবাজির চালেই মিথ্যে হয়ে যাবে না। কারণ ভোজবাজি—ভোজবাজিই, মিথ্যা-অলীক। প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠী পরম সমতায় নিজ মাতৃভাষাতে শ্রদ্ধাশীল থাকলে, চর্চায় মগ্ন থাকলে, উন্নতিবিধানে তৎপর থাকলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাববিনময়ে এবং মেলবন্ধনে আগ্রহী ও প্রয়াসী থাকলে প্রতিষ্ঠাভূমির মূল দৃঢ়প্রোথিত থাকবে—ভাষার দ্বন্দ্ব মিটবে এবং ক্রমভঙ্গুর হয়ে নয়, অতি সুসংবদ্ধ হয়ে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় মননে বিধৃত থাকবে।

লেখক ও সমাজ

ধীরা ভট্টাচার্য

একটি কথা প্রচলিত আছে, লেখকের কাজ সমাজের সমস্যাকে তার লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা আর সমস্যার সমাধানের কাজ সমাজ সংস্কারকের। লেখক কি সমাজের বাইরে? তুমি আমি, লেখক পাঠক, সমাজ সংস্কারক নিয়েই তো সমাজ। লেখক যদি সমাজের সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারেন তবে সে সমস্যাকে সমাধান করার দায়িত্বও তাঁর থাকবে না কেন? রামায়ণ, মহাভারত থেকে সুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত যত মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্প নাটক রচিত হয়েছে তার প্রধান উপজীব্য হচ্ছে ঘটনা বহুল সমস্য ও মানসিক দ্বন্দ্ব। জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কোন জীবনই মসৃণ ভাবে চলে না। ঘটনা, দুর্ঘটনা নানা রকম সমস্যায় একটি জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, অথবা অনুকূল পরিবেশ হলে জীবন সুখাবহ হয়। প্রতিটি মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা হবে প্রতিটি জীবনকে সুষ্ঠু ভাবে চালিত করা। নারী পুরুষ, পুরুষ নারী। পরস্পরের পরিপূরক। বৈরাগ্যের ঝুলি যিনি কাঁধে নিয়ে জন্মেছেন, তিনি আমাদের আলোচ্য বিষয় নন। আমাদের মত যারা সংসারী জীব, যাদের জীবনে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, যারা লেখকের লেখায় কাগজের পাতায় মূর্ত হয়ে ওঠে, সেই সব হতভাগা হতভাগী অথবা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী সামাজিক নর নারী, যাদের জীবনের মধুর বসন্তগুলি অনেক সামাজিক কুসংস্কারে ভেঙে যায় এবার তাদের দিকে আমরা চোখ ফেরাব। যেহেতু শরৎ সাহিত্য বাসরের সভাকক্ষে শরৎচন্দ্র নিয়েই সুরু করব তাই আমি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দু একটি চরিত্র নিয়েই আলোচনা করছি।

প্রথমেই বলি বহুপঠিত ও বহু আলোচিত "পল্লী সমাজের" কথা। পল্লী সমাজ এই নামের মধ্যেই গল্পের বক্তব্য অনেকটাই ধরে নেওয়া যায়। তিন অক্ষরের "সমাজ" কথাটির গুরুভার এত বেশী যে স্বল্প পরিসরে এর আলোচনা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের পক্ষে খুবই কঠিন। পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতি ও সকল সমাজের মধ্যেই সংস্কার নামক বস্তুটি ফল্গু নদীর মত অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে। যেহেতু সাহিত্যে বিশেষ করে গল্প উপন্যাসে সমাজ ও নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটি বড় করে চিত্রিত করা হয় সেখানে সংস্কারের কথা থাকবেই, তাতে সু হোক বা কু হোক। রমা ও রমেশের বাল্য-প্রণয় তাদের কাছাকাছি টেনে এনেছিল, কিন্তু বিবাহ হয়নি। রমার অন্যত্র বিবাহ হওয়া এবং বৈধব্য রমার জীবনকে অভিশপ্ত করে তোলে। রমা রমেশকে ভাল বাসত, রমেশও রমাকে ভালবাসত, কিন্তু চুম্বকের দুটী প্রান্তের মত দুজনে দুদিকে আজীবন সরে রইল, সমাজের কাছে তাদের এ অস্বীকৃত ভালবাসা দুটী জীবনকে ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করল। লেখক যখন রমা রমেশের ভালবাসাকে স্বীকার করে নিলেন তখন তাদের বিবাহ দিয়ে একটি সুখী জীবনের পত্তন করলেন না কেন? বিদ্যাসাগরের আমলে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শরৎচন্দ্র রমা রমেশের বিবাহ দিয়ে একটি সামাজিক কু প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধরতেই পারতেন। কিন্তু লেখক তা করেননি। তবে কি ভাবব, শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বিধবা বিবাহ দিতে ইতস্তত করেছিলেন। শরৎ সাহিত্য বাঙালী পাঠক সমাজে এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যা এখনও সমান ভাবে প্রভাবিত, যদি লেখক একটু সাহসের সঙ্গে তাঁর গল্প উপন্যাসে কয়েকটি বিধবা বিবাহ দেওয়াতে পারতেন তাহলে এই পোড়া দেশ-গাঁয়ে অন্ততঃ কয়েকটা মেয়ে সাহসের সঙ্গে পা

ফেলতে পারত। লেখক কবিদের বলা হয় ক্রান্তদর্শী। মানুষের মন নিয়ে লেখকের বিশেষ করে ঔপন্যাসিকের কারবার। বিধবা মেয়ের মনে ভালবাসা জাগিয়ে রেখে লেখক যেমন সমস্যার সৃষ্টি করলেন, বিবাহ দিয়েই তো তিনি সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। আজও আমাদের দেশের বিধবা মেয়েদের কষ্টের জীবনের শেষ হয়নি। কিছু মেয়ে চাকরী করে নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজেই নেয়। কিন্তু সংখ্যায় অতি নগণ্য। অধিকাংশ মেয়েকে হয় শ্বশুর বাড়ীর নয় বাপের বাড়ী অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। তার পরিণামে যে অশান্তি সৃষ্টি হয় তার বিস্তৃত বিবরণ এ স্বল্প পরিসরে দিতে চাই না। আপনারা সকলেই এ বিষয়ে অল্প বিস্তর জ্ঞাত আছেন।

মেজদিদির কেষ্ট অকালে বাপ মাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছিল, এমন অনাথ ছেলে মেয়ে আমাদের সমাজে বহু দেখতে পাওয়া যায়। একশ বছর আগে তো ছিলই আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে কর্ত্তা ঠাকুর নিজের গলায়ই ষোড়শীকে ঝুলিয়ে আনতেন। আর তার ফল আর এক সেট রাম, শ্যাম, যদু, মধু, লীলা, বেলা, চামেলির, পুষ্প মালা। নিষ্পাপ পবিত্র এই পুষ্পমালার ফুলগুলি ক্রমে ব্যাস্ত, পরিবার ছাড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করতে থাকল অর্থনৈতিক ও পরিবারিক দ্বন্দ্বকে বিষিয়ে তুলে। গল্প, উপন্যাসে সমাজের প্রতিচ্ছবি থাকবেই, শরৎচন্দ্রও তা থেকে সরে থাকেন নি। কেষ্টর বৈমাত্রেয় দিদিকে তিনি কেষ্টর ওপর মারমুখী করে চিত্রিত করেছেন। কাদম্বিনীর জা হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। অনাথ কেষ্টর জীবনের সমস্যা যেমন লেখক সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নিজের দিদি যদি কেষ্টর ওপর সহানুভূতিশীলা হয়ে নিজের দায়িত্বে তাকে পালন করতেন তাহলেই সমস্যার সঠিক সমাধান হত। বৈমাত্রেয় ভাই হলেও ছোট ভাইকে প্রতিপালন করা

তো দিদিরই কর্তব্য। বড় বোন আর বড় ভ্রাতৃবধূ মাতৃতুল্য এটা আমাদের সমাজের একটা প্রচলিত কথা। সেই ক্ষেত্রে হেমাঙ্গিনীর দয়া দাক্ষিণ্যের ওপর কেষ্টর বাঁচা মরার দায়িত্ব কেন বর্তাবে? লেখক কেষ্টর নিজের দিদিকেই তো একজন সহানুভূতিশীলা নারী করে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। একটি নারীর মহত্ব দেখাবার জন্য অপর একজন নারীকে পাঠকের চোখে হেয় করা কি ঠিক? সেই উপন্যাসই ততটা সার্থক যার চরিত্রগুলির সঠিক মূল্যায়ন করা হয়।

অরক্ষণীয়ার জ্ঞানদা, পরিনীতার ললিতা, স্বামীর সৌদামিনী, দত্তার বিজয়া এবং আরও অনেক নায়িকাকে লেখক নানা অঘটনের পর তীরে এনে তুলেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অতুল, শেখর, ঘনশ্যাম, নরেন ভাগ্যবান কেননা তারা তাদের বাঞ্ছিতাকে শেষ পর্যন্ত পেয়েছে। কিন্তু অচলা, সুরেশ, মহিম, রমা, রমেশ, বিরাজ বৌ, বড়দিদি, সুরেন্দ্র এমন চরিত্রগুলি আজীবন দুঃখ ভোগই করে গেল। কিরণময়ীর মত ট্রাজিক চরিত্র শরৎ সাহিত্যে আর আছে বলে মনে হয় না। সব থেকেও যার কিছু নেই। রূপে অতুলনীয়া ব্যাক্তিত্বে অনন্যা অথচ জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে এক মনোরমা চির দুঃখিনী নারী। সতীশের মুখে সুরবালার পতি-প্রেমের কথা শুনে কিরণময়ী তার স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় ভাল-বাসার চেষ্টা করেছিল। এই দৃষ্টান্তটা লেখক ভালই দেখিয়ে-ছিলেন, কিন্তু কেন যে কিরণময়ীকে লেখক শেষ পর্যন্ত একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে নামিয়ে আনলেন জানি না। কিরণময়ীর ভালবাসা প্রতিহত হয়ে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠেছিল, এটা মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে একটা বিকৃত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঠিক বটে তবে সাহিত্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এটা একটা সুষ্ঠু নিদর্শন নয়। আবার সংস্কারের কথায় ফিরে আসি, হারানের মৃত্যুর পর কিরণময়ীর একটি শুচি শুভ্র মূর্তি আমার কল্পনায় আসে, যে

মূর্তি দশের মঙ্গলের জন্য, সমাজের কল্যানের জন্য এগিয়ে আসতে পারত। কিরণের মুখ দিয়ে লেখক অনেক বড় বড় বিতর্ক মূলক কথা শুনিয়েছেন, কিন্তু কখনই তিনি পাঠক পাঠিকার সামনে সমাজের সামনে কিরণকে মহিমময়ী করে তোলেন নি। শরৎচন্দ্র তার গল্প উপন্যাসের নায়িকাদের সব সময় প্রেয়ের পথে না নিয়ে গিয়ে যদি শ্রেয়ের পথে নিয়ে যেতেন তাহলে পাঠক পাঠিকার চোখে, সমাজের কাছে তার নায়িকাদের ভাব-মূর্তি আরও উজ্জ্বল হত। সমাজ তো শুধু মানুষের সমষ্টি নয় তার একটা ভাবগত দিকও আছে, সাহিত্যে সৎ দৃষ্টান্ত নিশ্চয় সমাজের কু প্রথাকে আঘাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শরৎ সাহিত্যে পতিতার ছড়াছড়ি। অথচ একটি পতিতা নারীকেও তিনি সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। চন্দ্রমুখী, বিজলী, রাজলক্ষ্মী কাউকেই তিনি হাত ধরে টেনে তুলতে পারেন নি। অথচ এদের অন্তরে কোন দৈন্য ছিল না। বুকভরা ভালবাসা নিয়ে এরা জীবন-মৃত হয়েই থাকল। নারীর প্রতি শরৎচন্দ্র সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু কখনই তিনি তাঁর সৃষ্ট বিশেষ কয়েকটি নারী চরিত্রকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাদের সমস্যাসঙ্কুল জীবন তমসাবৃতই হয়ে রইল।

সাহিত্যে অশ্লীলতা যৌনতা কাম্য নয় তাতে সাহিত্যের মান ক্ষুণ্ণ হয়। শরৎ-সাহিত্য এ দোষ হতে মুক্ত। তবে সমাজের দুষ্ট ক্ষত, যা অনেক পরিবারকে পথে বসায় সুখের সংসারে আগুন জ্বালায়, সেই মদ্যপানের দিকে শরৎচন্দ্র তার নায়কদের অকৃপণ হাতে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নায়কদের সুরালোকের দিকে যতটা ঠেলে দিয়েছেন, সুর-লোকের দিকে তাদের একজনকেও নিয়ে যেতে পারেন নি।

উপসংহারে আবারও বলি লেখক সমাজের বাইরের লোক নন।

সমাজের সমস্যা যেমন তাঁর লেখায় তুলে ধরতে পারেন, সমাধানের পথও তেমন দেখাতে পারেন। লেখক আগে লেখক পরে তার অন্য পরিচয়। আমি এ কথা বলতে চাই না লেখকরা ঝাণ্ডা হাতে, শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে বা কোর্ট কাছারীতে গিয়ে আইনের সাহায্যে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করুণ। লেখক তার সাহিত্যের মাধ্যমেই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করুন বা ঘটনার এমন বিন্যাস করুন যাতে সমাজের পাঠক পাঠিকার মনে সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্মৃতিচারণ

দেবাশীষ গুহ

পেশায় চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমি একজন সাহিত্যানুরাগী। আমার এ কর্মব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিবেশে অনেক সাহিত্যরথীর সঙ্গলাভ হয়েছে—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মন্মথ রায়, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, হরপ্রসাদ মিত্র এবং আরো অনেকে।

দিনক্ষণ মনে নেই, যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৭ সালে যখন আমি বার্ণপুর ইস্কো একাউনটসে কাজ করতাম তখন তৎকালীন বার্ণপুর স্টেট ব্যাংকের অমায়িক, সাহিত্যানুরাগী সুদক্ষ ম্যানেজার মিঃ গুপ্ত। তিনি তারাশঙ্কর বাবু প্রমুখ অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকদের স্নেহভাজন ছিলেন। আমাকে ফোন করে বলেছিলেন—'চলে আসুন গুহ সাহেব, আপিসফেরতা আমার ডেরায়, তারাশঙ্করদা এসেছেন। আমি তাঁকে আমার একাউনটেণ্ট বন্ধু সাহিত্য রসিক গুহ সাহেবের কথা সবিস্তারে বলেছি।...

উনি আপনাকে আসতে বলেছেন। আপনাকে ভালো করে বাজিয়ে নেবেন।

দেখলাম আপনার সম্পর্কে বেজায় ইণ্টেরেস্টেড।' সব শুনে গুপ্ত সাহেবকে বলেছিলাম—'আমার ভয় করছে।'

প্রত্যুত্তরে এসেছিল দূরভাষণ মাধ্যমে এক অভয়বাণী—'মাভৈঃ উনি বাঘা সাহিত্যিক হতে পারেন কিন্তু বাঘ নন্। একেবারে, সদাশিব মানুষ।'

আপিস ফেরতা দুরুদুরু বুকে হাজির হলাম বার্ণপুর স্টেট ব্যাংকের দোতলায় তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ গুপ্তের আবাসস্থলে।

উনি আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া সাহিত্য সভায়। সাহিত্যের মুকুটমণি মজলিশি তারাশঙ্কর বাবু তার মধ্যমণি ছিলেন।

মিঃ গুপ্ত সহাস্যে তারাশংকর বাবুকে বলেছিলেন—'এই সেই গুহ সাহেব, যাকে ভাল করে বাজাবার জন্যে আপনি তলব করেছিলেন।' সানন্দে উনি আমাকে পাশে বসিয়েছিলেন। মনে হল এক সুন্দর মহান ব্যক্তিত্ব। হেসে আমায় বলেছিলেন 'ভালো করে বাজাবার জন্যেই পাশে নিয়ে বসালাম।' সমস্ত ভয় কর্পূরের মত উবে গেল। সভা তখন আধুনিক সাহিত্য ও অবক্ষয় নিয়ে মশগুল। আমিও কয়েকটি সরস টিপ্পনি কেটেছিলাম। ওনার বোধহয় ভাল লেগেছিল। তারপর এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, নীরস একাউণ্টসের লোক হয়েও কি করে এত সুরসিক হও, চট্পট্ জবাব দেও।'

মনে পড়ে গেল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সুলেখক সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ ভ্রমণের' সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা সেই শুষ্ক পাষাণ হতে রস সংগ্রহ করত। আমি সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের

কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম 'আমি সেই অশ্বত্থ বৃক্ষতুল্য। তাই শুষ্ক একাউণ্টসের লোক হয়েও সাহিত্য রসামৃত পান করি।' সভায় সাময়িক হাসির ফোয়ারা উঠেছিল। শুনে উনি হেসে বলেছিলেন,—'ভায়ার যে হাজির জবাব। আমি চাই, তুমি সুসাহিত্যিক হও।' তখন আমাদের মধ্যে 'দাদা-ভাই' সম্পর্ক বেশ গজিয়ে উঠেছিল। ফস্ করে বলেছিলাম 'সে গুড়ে বালি। আপনি বললেই কি হবে? একাউণ্টসের কাজে সদা ব্যস্ত। লিখব কখন? লেখার—অবসর কোথায়?'

উনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,—'এরই মধ্যে টাইম করে লিখবে। ধাপে ধাপে উঠতে হবে।' এগিয়ে চল। চরৈবেতি চরৈবেতি।'

সেই প্রেরণায় এখনো লিখে চলেছি—গল্প, রম্যরচনা, কবিতা ও ছড়া, বাংলা ও ইংরেজী লিমেরিক ও আরো কত কী।

এ যেন এক সাহিত্য রচনার চরৈবেতি চলছে। আরো এগিয়ে চল। সেদিন আলাপ বেশ জমেছিল কিন্তু গুপ্তসাহেব তারাশংকরদাকে বলে উঠেছিলেন,—'সাহেবের বাংলো বার্ণপুরে নয়। দূরে আসানসোলের ইভলীন লজে।' তাড়াতাড়ি না গেলে বৌমা ভাববে।' আমি তাকে প্রণাম জানিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছিলাম।

মনে মনে ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম, কত উচুদরের মানুষ তারাশংকরদা। কী সুন্দরভাবে আমায় অনুপ্রাণিত করলেন। মাথায় এক ভারী চিন্তা এসেছিল। এই উঁচুমাপের মানুষ লেখক তারাশংকর বাবুর বাড়ী বীরভূমের লাবপুরে, আর এই বীরভূমেরই মানুষ—মানুষের পূজারী। ভগবৎপ্রাণ, অমর কবি চণ্ডীদাসের লীলাক্ষেত্র, যেখানে উনি এক মন্দিরের পূজারী হয়েও রামি ধোবানিতে তাঁর আসক্তি হয়েছিল। সত্যই পিরীতি না জানে রীতি। উনি উপলবদ্ধি করেছিলেন মানুষকে। তাইতো

তার অমরবাণী—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

তারাশংকর বাবু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি আমার কাছে আরো অনেক বড়। প্রসন্নতায় কানায় কানায় ভরা মন নিয়ে ইভলীন লজের বাড়ীতে ফিরেছিলাম।

আজও সেই সাক্ষাৎকারের সুখদ স্মৃতি মনের মনিকোটায় এক উজ্জ্বল মাণিক্য রূপে বিরাজ করছে।

বিচ্ছু রবিন দে

সবুজ গাছপালা আর ছোট ছোট পাহাড়ের সারি দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। জসিডী, শিমুলতলা আর ডিগরিয়া পাহাড় থেকে কাছেই। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া একটা ঝরনার পাশেই একটি ছোট্ট পাহাড়।

শীতের সকালে সারা পরিবার নিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু চড়ুইভাতি করতে এলেন। সঙ্গে তাস, গিটার, মাউথ অর্গান আর চানাচুর।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই ব্রজেশ্বরবাবু উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন—ওয়াণ্ডারফুল! এখন সব ছুটি। আনন্দ কর, বেড়াও, ফূর্তি কর।

প্লাস্টিকের বল, গিটার নিয়ে সবাই পাশের ছোট পাহাড়ের ওপর চলে গেল।

মোক্ষদা আর সুধাময়ী চপ্ ভাজার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। একটি গাছের তলায় সতরঞ্জি বিছিয়ে তদারক করতে লাগলেন ব্রজেশ্বর বাবু। এমন সময়ে—'মায়ী, লকড়ি চাইয়ে?' বলে

সুকনো গাছের ডালপালার বিরাট বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট ছেলে।

বড় জোর দেড় ফুট উঁচু। দশবারো বছর বয়েস। গোল গাল চেহারা। খালি গা। একটা ছেঁড়া হাপ প্যাণ্ট পরনে।

সুধাময়ী খুশি হয়ে বললেন,—'নিশ্চয় নিশ্চয়।' মাথা থেকে বোঝাটা নামিয়ে ফোকলা দাঁতে ছেলেটা হাসলে।

—'কত দাম ?'

ফোকলা দাঁতে হেসে ছেলেটা ঘাড় নাড়লে।

—'পয়সা নেহি। হামকো মিঠাই খিলাও।'

সুধাময়ী হেসে ফেললেন। ছেলেটার গালটা টিপে দিয়ে দুটো দরবেশ দিলেন।

—'তোর নাম কি রে ?'

দরবেশ খেতে খেতে ছেলেটা বললে,—'বিচ্ছু।'

—'বাঃ, সুন্দর নাম।'

খাবার পর হাত চাটতে চাটতে বিচ্ছু বললে,—'মাইজী, আপকো পানি মাংতা ?'

—'হ্যাঁ রে। নিশ্চয়।'

বিচ্ছু বালতি দিয়ে ছুটলো ঝরণার দিকে।

গরম গরম চপ্ ভাজা হচ্ছে। সুধাময়ী বললেন,

—'যা বিচ্ছু। টিলার ওপর থেকে বৌমা, ছেলে, মেয়ে সবাইকে ডেকে আন। বলবি, গরম গরম চপ্ রেডি।'

বিচ্ছুকেও একটা দিলেন। চপ্ খেতে খেতে বিচ্ছু ছুটলো।

একটু পরেই বিচ্ছু ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো,—'মাইজী, হামকো বহুত মারা হায়। গালি ভি দিয়া।'

বিচ্ছু চোখ রগড়াতে লাগলো।

—'সে কি রে! তোকে কে মেরেছে ?'

—'ঐ যো পেণ্ট, কুর্তি পরা...জুতি ভি পরা...তাগড়া জোয়ান।'

ব্রজেশ্বর বাবু ছুটে এলেন। অবাক হয়ে বললেন,—'তাগড়া জোয়ান, পায়ে জুতো পরা...আবার কে ?'

সুধাময়ী বললেন,—'নিশ্চয় বৌমার ভাই বাবলু। ঐ তো প্যাণ্ট, সার্ট পরা...জোয়ান ছেলে।'

বিচ্ছু কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'হাঁ হাঁ ঐ, উসকো সাথমে যো লাল ফ্রক পরা লেড়কী থা, ওভি মারা...।'

বিচ্ছু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

—'লাল ফ্রক ? বুঝেছি, লাল সালোয়ার কামিজ পরা নিশ্চয় আমাদের খুকু।...কিন্তু ওরা তোকে মারলে কেন ?'

—ঐ দোনো এক সাথমে বৈঠা...আউর দোনো দোনোকো পাকাড়কে হামি খাতা...বহুত হামি খাতা। হাম দেখ লিয়া। ঐসি বাস্তে ঐ দোনো বহুত গোসা হো গিয়া...।'

বিচ্ছু ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলো।

ঐ শুনেই ব্রজেশ্বর বাবু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন—'কেয়া! খুকুকে বাবলু হামি খাতা ? তবে বৌমা ঘোড়ার ডিম কেয়া করতা ?'

অনেকে রাগের চোটে অনর্গল ভুল ইংরাজী বলে ফেলেন। ব্রজেশ্বর বাবু সেই রকম হিন্দী বলে ফেলেন।'

বিচ্ছু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে,—'উধার বড়া গাছ তলামে শাড়ী পরা জেনানা বৈঠা বৈঠা গানা গাতা হায়, আউর উনকো গোদী মে ধোতি পরা আদমি শুয়া থা। দোনো এক সাথমে গানা গাতা, আউর ফ্লুট ভি বাজাতা···।'

ব্রজেশ্বর বাবু লাফিয়ে উঠলেন,—'এ্যাঁ, আমাদের খোকা বৌমার কোলে শুয়ে গানা গাতা ?' ফ্লুট বাজাতা ? তা হলে তো, উসকো হাড্ডি তোড় দেগা।'

বৃদ্ধ ব্রজেশ্বর বাবু মুষ্ঠিবন্ধ হাত তুলে ছুটলেন হাসা পাহাড়ের দিকে।

সুধাময়ী ছুটে এলেন,—'আহা কর কি, কর কি? এই নির্জন ফাঁকা যায়গায় আমাদের খোকা, বৌমা যদি একটু ইয়ে করেই থাকে, তো হয়েছেটা কি?'

—'তা বলে সেই ফাঁকে, বৌমার ভাই খুকুকে ধরে হামি খাবে? এ কি মগের মুলুক পায়া হায়?'

—'কিন্তু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বুড়ো বয়েসে তুমি যে পড়ে মরবে।'

সুধাময়ী বিচ্ছুকে একপাশে নিয়ে গিয়ে আর একটা চপ্ একটা দরবেশ দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, চোখ মুছিয়ে বললেন,—বাবা বিচ্ছু, ওপরে গিয়ে বৌমাকে চুপি চুপি বলবে,—'এখুনি নিচে যাও। খুব দরকার, বুঝলে?'

বিচ্ছু চোখ মুছে বললে,—'ঠিক হায় মাইজী, হাম জরুর বোলেগা।'

দরবেশ আর চপ্ খেতে খেতে বিচ্ছু চলে গেল।

পাহাড়ের ওপর উঠে বিচ্ছু দেখে, গাছের ছায়ায় সকলে বসে চানাচুর আর জিলিপি খাচ্ছে। তাস খেলছে। গিটার বাজাচ্ছে। কেউ তালে তালে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে।

বিচ্ছু ফোঁপাতে ফোঁপাতে সেখানে গিয়ে হাজির হল।

—'কি রে, কাঁদছিস কেন?'

—'ঐ বুড্ঢা আদমী হামকো বহুত মারা হায়।'

সকলে মুখ চাওয়া চায়িকরলে,—'নিশ্চয় দুষ্টুমি করেছিলি?'

—'নেহি নেহি। উধার ঐ বুড্ঢা আদমী ঐ বুড়ঢী আদমীকো জোরসে পাকাড় কে হামি খাতা...হরবখত হামি খাতা। হাম হুয়া পর লিয়া পড়া। ইসি লিয়ে হামারা পর বহুত গুস্সা হো গিয়া। হামকো বহুত মারা।'

তাস খেলা ফেলে খোকা, বৌমা ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলো। খুকুর গিটার থেমে গেল। বাবলু মাউথ অর্গান থামিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো।

খোকা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—'কি বলছিস কি?'

রুমা বৌদি তাড়াতাড়ি উঠেই সকলকে শান্ত করে, বিচ্ছুকে আড়ালে একপাশে নিয়ে গেল।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে, ওকে চানাচুর আর একটা জিলিপি দিয়ে বললে,—বাবা বিচ্ছু, এ সব কথা আর কাউকে কখ্খনো বলিস না, বুঝলি?'

চোখ মুছে বিচ্ছু ঘাড় নাড়লে,

—'ঠিক হায় মাইজী, হাম কভি নেহি বাতায়ে গা।'

তারপর আবার হাত পাতলে।

রুমা বৌদি আর একটা জিলিপি দিলেন।

চানাচুর আর জিলিপি খেতে খেতে বিচ্ছু চলে গেল। মুখ কাচুমাচু করে সকলে নিঃশব্দে নেমে আসতেই সুধাময়ী একবার কটমট করে চাইলেন,—'বৌ মা, পাহাড়ে উঠে খুকু নিশ্চয় খুব ধিঙ্গিপনা করে বেড়াচ্ছিলো?'

—'না মা ও লক্ষ্মী হয়ে আমাদের সঙ্গেই ছিল।'

—'থামো। আমার কানে সব আসে।'

এ সব অনেক দিনের কথা। এর বেশ কিছু দিন পরে রুমা-বৌদি। খুকু আর সবাই ট্রেনে করে আবার বেড়াতে বেরিয়ে ছিল। সঙ্গে এক সহযাত্রিনী আর সদ্য বিবাহিতা কিশোরী। সকলেই গল্পে মত্ত।

দূর থেকে ডিগরিয়া পাহাড়, হাসা পাহাড় আঙ্গুল তুলে দেখাতে লাগলো।

সহযাত্রিনী অবাক হয়ে বললেন,—'ওখানে ঝরণার ধারে হাসা পাহাড় আপনারাও দেখেছেন ?'

রুমা বৌদি, খুকু উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো।

সহযাত্রিনী বিস্মিত হয়ে বললেন,—'তবে কি ওখানে দেড়ফুট উঁচু বারো বছরের বিচ্ছুকেও আপনারা দেখেছেন ?'

সকলে হাত তালি দিয়ে উঠলো।

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়। বিচ্ছুকে কোনোদিন কেউ ভুলবো না।'

সদ্য বিবাহিতা কিশোরী মেয়েটির মুখ হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালালো।

সহযাত্রিনী মুচকি হেসে বিবাহিতা হেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন,—'বিচ্ছুই তো ওদের বিয়ের ঘটক।'

—'কি আশ্চার্য, বিচ্ছু বিয়ের ঘটক !'

সকলেই মনে মনে বুঝলো, বিচ্ছু নিশ্চয় সেখানেও অসাধারণ কোনো কাণ্ড বাঁধিয়ে ছিল।

এইবার খুকুও ওখান থেকে ছুটে পালালো।

রুমা বৌদিও মুচকি হাসলেন—'শুধু আপনাদের নয়', খুকুকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'বিচ্ছু ওরও ঘটকালি করেছে।

মানবী সুধা চট্টোপাধ্যায়

'খুকু মা, ওঠ, ওঠ, কত আর কাঁদবি, মা ?' বলে তার পালিকা মাতা লছমীবাঈ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার শুয়ে থাকা দেহটাকে টেনে তুলে বসিয়ে দেয়। চোখের জলে ভেজা মুখটাকে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে বলে, 'বাচ্চাটাকে দেখ মা। দুধ খাওয়া। সেই দুষমনটাকে ভুলে যা।' সেই ডাইনিটা তাকে দুষমন বানিয়েছে।

না হলে এমন পদ্মফুলের মত বৌ, এমন ফুলের মত বাচ্চা দুটোকে সে ভুলে থাকে কেমন করে ?'

এই খুকুমার নাম মঞ্জুলা। অপরূপা সুন্দরী যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী। মানুষের যে এত রূপ হয়, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার স্বামী মনোরম। তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিল। তার বাবা-মায়েরও অমত ছিল না। ধনীর আদরিণী একমাত্র কন্যা সে। উচ্চ শিক্ষিতা। নাচে গানে ছবি আঁকায় রন্ধন-পটুতায় সে সর্বগুণ সম্পন্না। তেমনি তার নম্রস্বভাব। তিনমাস বয়সে মাতৃহারা। তাকে সন্তানের মত বড় করেছে, ঐ লছমীবাঈ, অবাঙ্গালী মহিলাটিই।

তার বিয়ে দিয়ে তার বাবা অল্প কিছুদিন বাদেই দুর্ঘটনায় পরলোকে চলে যান। বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে সে তার পিতৃগৃহেই বাস করছে। শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁদের আর দুই ছেলের কাছেই থাকেন। কিছুদিন ধরেই মঞ্জুলা তার স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ করছিল। কয়েকদিন হল জানতে পেরেছে তার বান্ধবীর কাছ থেকে যে তার স্বামী অন্য এক মহিলার প্রতি আসক্ত।

তাই তাকে অবহেলা করতে সুরু করেছেন ! মঞ্জুলা শোক-মগ্না। সেই মহিলার স্বামীও তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। বিয়ের পরদিনই। সম্পত্তির লোভেই তাকে বিয়ে করেছিলেন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা পণ নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। সেই থেকে ঐ মহিলাটি পুরুষ জাতির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে এই খেলায় মেতেছেন। অনেক পুরুষই তার রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে আসে। সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কারোকেই বিয়ে করে না। তাদের স্ত্রীরা বিনা দোষে জ্বলে পুড়ে মরে।

এই মহিলার নাম কল্পনা। মামার বাড়ীতেই মানুষ। তার ছোট মামা তার থেকে মাত্র দু বছরের বড়। একদিন সেই ছোট মামা, যে তার বন্ধুর মত, বাড়ীতে এসে, উপস্থিত হল। দরজায়

কলিং বেল টিপতেই কল্পনা এসে দরজা খুলে তার ছোট মামাকে দেখে ছোট্ট মেয়ের মত আনন্দে করতালি দিয়ে বলে উঠল, 'আরে ছোট মামা যে, আজ আমার কি সৌভাগ্য। তুমি এলে ছোট মামা।' কল্পনা তার কাজের মেয়েকে ডেকে বলল,—'চায়ের জল বসিয়ে দোকানে যা।'

কাজের মেয়ে বিনু, ঐ বাড়ীরই কাজের ছেলেকে চোখের ইসারায় জানিয়ে দিল, আবার একজন এল, দেখছিস ? বলে দুজনে নীরবে হাসতে লাগল।

ছোট মামা কিন্তু একটিও কথা না বলে মুখটাকে গম্ভীর করে বলে উঠল,—'কতকগুলো কথা শুনে জানতে এলাম, সত্যি কিনা।' কল্পনা বুঝতেই পারল তার এই খেলার কথা ছোট মামার কানেও গিয়েছে। যেন কিছুই জানেনা এই ভাবে বলে উঠল, 'কি শুনেছ ছোট মামা বল, বল।' ছোট মামা গম্ভীর হয়েই বলে উঠলো, 'তুই নাকি পুরুষদের নিয়ে খেলা সুরু করে দিয়েছিস ? এসব কি হচ্ছে ? ছিছি।' বলে সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ল।

ঘরটি বেশ পরিপাটি করে সাজান। দেখলেই গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্পনা, তিরস্কারে লজ্জিত হয়ে দুই হাতে মুখটা ঢেকে মামার পাশে বসে পড়ল। অর একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বার হল না। ছোট মামা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'নিজের জীবনের জ্বালাটা তুই, অন্যের মনে ছড়িয়ে দিয়ে কি আনন্দ পাচ্ছিস, বুঝছি না।' বলে অনেকক্ষণ ধরে তাকে অনেক কথা বলে যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি ভাবেই চলে গেল। কল্পনা যেন পাষাণ-প্রতিমার মত স্থির হয়ে বসে থাকল।

লছমী বাঈয়ের কথায় মঞ্জুলা উঠে হাত মুখ ধুয়ে বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। তার মনে হচ্ছে মনের আঘাতে তার দেহের শক্তিটাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

এমন সময়, লছমী বাঈ এসে বলল, 'খুকু মা, একজন মহিলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মঞ্জুলা বলল, ভেতরে নিয়ে এস। আমি উঠতে পাচ্ছিনা।

মহিলাকে নিয়ে লছমিবাঈ ঘরে এসে ঢুকল। তার রূপের প্রভায় ঘরটি যেন আলোকিত হয়ে উঠল। আকাশের মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ উঠলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মঞ্জুলা নিষ্পলক থেকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'বসুন দিদি, বসুন।' লছমীকে বলল, 'মা। দিদিকে চা মিষ্টি এনে দাও। মঞ্জুলা সবার সাথেই এমনি মধুর ব্যাবহার করে। এক্ষেত্রেও তাই সরল। মহিলা মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'না, ভাই না। আমি এই মাত্র জলযোগ করে এসেছি। এখন কিছু খাব না, ভাই। খাটের ওপোর শোয়ান সুন্দর শিশুটিকে বুকে তুলে আদর করতে লাগল।

এমন সময় মনোরর এসে সেই ঘরে ঢুকল। ঢুকেই মহিলাকে দেখে ভুত দেখার মত চমকিয়ে উঠল। 'একি তুমি এখানে ?' কল্পনা তার স্বভাব সুলভ হাহা করে হেসে বলে উঠল, 'কি আমাকে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছ মনে হচ্ছে ? ধরা পড়ে গিয়েছ বলে বুঝি ?' মনোরমের মুখ দিয়ে আর কথা বার হল না।

মঞ্জুলা উঠে এসে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একে চেনেন নাকি ? ইনি আমার স্বামী। একজন মহিলার প্রেমে পড়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভুলে গিয়েছেন।' তার পরের ঘটনা যেন একটি নাটকের দৃশ্যের মতই ঘটে গেল।

কল্পনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠল, 'আমিই সেই মহিলা, আপনার স্বামী যার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। উপার্জনের অর্থ তার পায়ে ঢেলে দিচ্ছেন। আর তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন।' বলে মনোরমের দিকে

তাকিয়ে ভৎর্সনার সুরে বলে উঠল, 'ছিছি তুমি এই রকম কাপুরুষ। নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়েছ? জান আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি?' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মঞ্জুলার দিকে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বোনটি, তোমার স্বামীকে তুমি ফিরিয়ে নাও, ভাই। ওকে আমি ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করলাম। যে সব নরাধম বিবেক হারিয়ে আমার রূপের আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমি জানতে পারলে তাদের ফিরিয়ে দিই।' বলে তড়িৎ গতিতে মনোরমের হাতটা মঞ্জুলার হাতে ধরিয়ে দেয়। নিজের গলার হীরের নেকলেসটা খুলে মঞ্জুলার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমার স্বামী আমাকে ভালবেসে যেটা আমায় দিয়েছিল সেটি আমি তোমায় ফিরিয়ে দিলাম।' বলে ত্বরিত পদে ঘর থেকে বার হতে যাচ্ছে।

মঞ্জুলা, ছুটে এসে দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'দিদি তুমি সত্যি দেবী' বলে তাকে প্রণাম করতেই কল্পনা বলে ওঠে, 'নানা, বোন, আমি তোমাদের মতই রক্ত মাংসে গড়া মানবী। দেবী নই।'

বিয়োগ থেকে যোগ হরি ভট্ট

পূর্বপ্রকাশিত পর

তিন

বালীগঞ্জের দেশপ্রিয় পার্কের একটা বেঞ্চে বসে এক তরুণী, দেখতে বেশ সুন্দরী, তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা গল্পের বই বার করে, খুব মনোযোগ সহকারে পড়ছে পাশে ব্যাগটি রেখে। নিশ্চিন্ত নিরলস ভাবেই বইটাতে মন-সংযোগ করেছে। সকাল সাতটা থেকে আটটা হবে মনে হয়। সকালের ঠাণ্ডা

ফুরফুরে হাওয়া কানের পাশের চুলগুলি উড়ে মাঝে মাঝে মুখে এসে পড়ছে। পড়তে পড়তেই ডান হাত দিয়ে চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে আবার পড়ায় মন দিচ্ছে। পার্কে অনেক ছেলে মেয়ে খেলা করছে। কোনো দিকেই তার নজর নেই। গভীর চিন্তাশীল ভাবেই বইটিতে চোখ রেখে, উপরের দাঁত দিয়ে নিচেয় ঠোঁটটা কামড়ে মাঝে মাঝে কি ভাবে। আবার পড়ে। তারই বেঞ্চের পাশের জায়গায় একটু দূরে বসে একটা ছোকরা বিড়ি টানছে ও মাঝে মাঝে তরুণীটির পাশে রাখা ব্যাগটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সে দিকে মেয়েটির কোনো নজর নেই। একটু দূরে একটা ফুল গাছের নিচে বসে মাথায় গামছা বাঁধা একটা গাঁইয়া ছেলে এসব লক্ষ্য করছে। সেদিকে কিন্তু ঐ যুবকটির ও তরুণীটির কোনো খেয়াল নেই।

হঠাৎ মেয়েটির পাশে বেঞ্চে বসা ছোকরাটা মেয়েটির ব্যাগটা নিয়ে দে ছুট্। মেয়েটি দেখলো, পাশে রাখা তার ব্যাগটা নিয়ে একটা ছোকরা ছুটে পালাচ্ছে। অনন্যোপায় হয়ে সে তখন চিৎকার করতে করতে বলতে লাগলো, চোর চোর আমার ব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছে ওকে ধরো। সবিস্ময়ে দেখলো চোরটার পিছু পিছু একটা গেঁইয়া ছেলে ছুটে চলেছে ওকে ধরার জন্য। তরুণীটিও ওদের পিছু পিছু চোর চোর, বলে চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগলো এবং তাদের পিছু পিছু কিছু মারমুখি জনতাও ছুটতে লাগলো। পাড়া গাঁয়ের ঐ ছেলেটা তীর বেগে ছুটতে ছুটতে প্রায় চোরটাকে ধরে ফেলার জোগাড় করেছে। হঠাৎ ঐ চোরটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঐ ব্যাগটা গেঁইয়া ছেলেটার সামনে ফেলে দিয়ে সেই ঐ গেঁয়ো ছেলেটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চোর চোর বলে চিৎকার করতে লাগলো।

ততক্ষনে পিছনে ছুটে যাওয়া বেশ কিছু মারমুখি লোক পৌঁছে গেছে এবং ঐ গেঁয়ো ছেলেটাকেই চোর ভেবে তাদের

যথেচ্ছ ভাবেই সকলে কিল চড় ঘুঁষি চালালো। লাঠি দিয়েও বেদম পেটাতে লাগলো। ছেলেটা যত বলতে যায় চিৎকার করে, 'দেখুন, আপনার ভুল করছেন। আমি চোর নই। চোর এই ছোকরাটা।' কিন্তু কে তার কথা শোনে? এক সময়ে মারের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ছেলেটা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তখন পিছন থেকে ছুটে আসা তরুণীটি সামনে তার ব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নিয়ে বললো, 'এই যে আমার ব্যাগ পেয়েছি।' কিন্তু হায় হায় গেঁইয়া ছেলেটার ওই দশা দেখে সে—উপস্থিত মারমুখি জনতার দিকে চেয়ে বললো, 'এ আপনারা কি করেছেন? এই ছেলেটার জন্য আমার ব্যাগটা ফিরে পেয়েছি। এ চোর নয়, বরং চোরকে ধরার জন্য তার পিছু ধাওয়া করা ছেলে, আপনারা শুধু এই নিরপরাধ ছেলেটাকে মেরে এই হাল করে ছাড়লেন।'

তখন সবিস্ময়ে সবাই দেখলো, সেই চোর ছেলেটা এক ফাঁকে কখন সরে পড়েছে। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ছেলেটার মাথা ফেটে রক্তের ধারা বইছে। সারা শরীর থেতলানো। যেন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হয়েছে। জ্ঞান নেই। ওই দেখে তরুণীটি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। দেখে উপস্থিত সকলেই খুব অনুশোচনা করতে লাগলো। তরুণীটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনারা দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন, আমি একে নিয়ে আমার বাড়ীতে চলে যাই। এখুনি এর সুশ্রুষার প্রয়োজন। কেউ গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবার পরে সকলের সাহায্যে তরুণীটি ঐ ছেলেটাকে গাড়ীতে তুলে নিজের বাড়ীর উদ্দেশ্যেই রওনা হোলো। উপস্থিত জনতার ভিতর থেকে দুচার জনও অনুতপ্ত হয়ে ঐ গাড়ীতেই ছেলেটাকে নিয়ে মেয়েটার বাড়ীর উদ্দেশ্যে চললো। অবশ্য জনতার কাছে মেয়েটার কথা সত্যি

সেটা প্রমাণ দিতে ব্যাগের মধ্যে রাখা অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তার নাম লেখা কার্ড ও দুহাজার টাকা ছিল সেটা দেখিয়ে তবেই মার-মুখি জনতাকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল।

এখন গাড়ীতে যেতে যেতে ঐ ছেলেদের উদ্দেশ্যে তরুণীটি বললো, 'আপনারা কি বলুন তো, একটা ছেলেকে তো কিছু না জেনেই পেটালেন? আচ্ছা যদি ছেলেটা চোরই হয়, তাহলেও এ রকম মরণাপন্ন দশা করার অধিকার কে দিয়েছে আপনাদের? আপনারা ওকে পুলিশে দিতে পারতেন। তা না করে একজন নির্দোষ ছেলেকে অমন করে পেটালেন?'

একজন বর্ষীয়ান ছেলে বললো, 'ম্যাডাম আপনি তো জানেন না, কোন চোর বা ডাকাত ধরতে তাদের শেলটার এখন ওই পুলিশ? পরে কেশ ভ্যানিশ তাই তো জনতা আইন নিজেদের হাতে নিচ্ছে, আজকাল এই তো বলছে, চোর ডাকাত ধরলে, শেষ করে দাও। আর ও যে সত্যিকার চোর নয় আমরা বুঝবো কি করে বলুন? পরে আপনার মুখে শুনে এখন আমাদের সত্যিই অনুশোচনা হচ্ছে।'

মেয়েটা সকলকে বললো দেখুন কোথাকার গাঁয়ের ছেলেটা আমার উপকারের জন্য বেঘরে তার প্রাণটাই বুঝি দিয়ে দিচ্ছেন, যদি আমি সময়ে না যেতাম তাহলে এতক্ষণে আপনারা ওকে লাশ বানিয়ে ফেলে চলে যেতেন।' ঝর ঝর করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু মেয়েটার গাল বেয়ে ঝরে পড়লো। নাঃ আর সে ভাবতে পারে না।

প্রতাপাদিত্য রোডের প্রকাণ্ড চার তলা বাড়ীর গেটের সামনে গিয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়ালে। গেটের পাশে নেম প্লেটে লেখা কিশোর বসু, বার এ্যাট্‌ল" ক্যালক্যাটা হাই কোর্ট।

গাড়ী থেকে নেমে মেয়েটি চিৎকার চেঁচামিচি আরাম্ভ করে

দিল—'এই দারোয়ান, এই ড্রাইভার, এই বনমালী এই ভোলা সকলে এক্ষুনি এখানে এসো। বিশেষ দরকার।' দিদিমণির চিৎকারে তটস্থ হয়ে বাড়ীর দারোয়ান ঝি, চাকর সকলেই ছুটে এলো। কি হোলোরে বাবা, মেয়েটীর বাবা ব্যারিস্টার কিশোর বাবু ও মা সুনয়নী দেবী উপরের ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা কি ? তাঁদের একমাত্র মেয়ে সুলতার চিৎকারে উৎসুক হয়ে তাঁরা দেখতে লাগলেন কয়েকজন ছেলের সাহায্যে একটা জ্ঞানহীন ছেলেকে অতি সন্তর্পণে গাড়ী থেকে নামানো হচ্ছে। দেখে তাঁদের ও সকলের মনে হোলো একজন গাঁয়ের চাষী ঘরের ছেলে। তার এ অবস্থা কি করে হোলো ভেবে সকলে আশ্চর্য হোল। সকলের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে ছেলেটিকে গাড়ী থেকে নামিয়ে সুলতা বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, কৌতূহলি ও আশ্চর্য হয়ে কিশোরবাবু ও সুনয়নী দেবী উপর থেকে শশব্যস্তে নিচের হল ঘরে নেমে এলেন। সেখানে বসবার জন্য বড় বড় সোফা ইতস্তত পাতা আছে। মাঝে বড় একটা টেবিল। সবিস্ময়ে তারা দেখলেন ছেলেটার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। চোখ মুখ ঘোলা। তাকে দেখে সবাইকার মনে হোলো বোধহয় কোনো হেভি এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। মাথায় প্রায়—চার-পাঁচ ইঞ্চি একটি গভীর ক্ষত। সেখান থেকে রক্তপাত হয়ে ছেলেটার ময়লা জামা. কাপড় মুখ, বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। চোখ দুটো ও মুখ খুবই ফোলা। অজ্ঞান ও অতিক্ষীণ ভাবে টেনে টেনে নিঃশ্বাস ফেলছে।

সুলতার নির্দেশে ছেলেটিকে একটি বড় সোফায় শোয়ান হয়েছে, এবং মাথার উপরে বড় শিলিং ফ্যানটা ফুলস্পীডে ঘুরছো। সুলতা সত্বর দৌড়ে উপরে চলে গেলো তার ডাক্তার কাকুকে ফোন করতে। সকলেই সুলতার এই সব কাজ নিঃশব্দে দেখছে। কিন্তু সুলতা কাউকে কিছু প্রশ্ন করার অবকাশ দিচ্ছে না।

কিছুক্ষনের মধ্যে ডাক্তার কাকুকে ফোন করে সুলতা তাঁর ফার্স্ট এডের বাক্সটা নিয়ে নিচে নেমে এলো ও তার পরিচর্যায় লেগে গেলো। এতক্ষণে কিশোর বাবু ও সুনয়নী দেবী একসঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেটি কে ? কোথায় কি ভাবে এমন সাংঘাতিক এ্যাকসিডেণ্ট হোলোরে মা ?'

সুলতা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। মা ও বাবার প্রশ্নের উত্তরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ও বলল, 'এর এই অবস্থার জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে আমিই দায়ী।' পরে তার ব্যাগ চুরি যাওয়া থেকে আরম্ভ করে ছেলেটার এই অবস্থার কথা সবই আনুপূর্বিক মা ও বাবার কাছে বলতে বলতে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলো।

সব শুনে তার বাবা ও মায়ের চোখেও জল এসে গেলো। মা সুনয়নী দেবী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এমনিই হয় রে মা। যারা দোষী, সমাজে তারাই সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায়' আর এই ছেলেটার মত নিরীহ লোকরাই অহর্নিশ মার খেয়ে মরে। প্রতিবাদ করার ভাষা মুখে জোগায় না।

এতক্ষণে সুলতা ছেলেটার মাথার ও মুখের রক্ত মুছিয়ে দিয়েছে এবং ওর আধময়লা জামাটা সন্তর্পণে খুলে দিয়ে মাথার ক্ষতস্থানের পাশ থেকে কাঁচি দিয়ে চুলগুলো কেটে দিয়েছে। ও একটু গরম দুধ ফিডিং কাপের সাহায্যে খাইয়ে দিয়ে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে মা ও বাবাকে উদ্দেশ করে বললো, 'আগে ডাক্তার কাকা দেখে যাক্ পরে একে আমি উপরের ঘরে অর্থাৎ আমার ঘরের পাশের ঘরটায় নিয়ে যেতে চাই। তোমরা কি বলো ? তাতে ছেলেটিকে দেখার ও নার্শিং করবার আমার সুবিধে হবে।'

বাবা ও মা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'বেশতো তুই যা ভালো বুঝিস তাই করবি।'

মা ও বাবার সম্মতি পেয়ে সুলতা বলতে লাগলো 'বাবা, লোকগুলো কি নিষ্ঠুর এই রকম একটা ভালো ছেলেকে কি করে ওই রকম মারতে পারে? সময় মত আমি না গেলে ওরা একে মেরেই ফেলে দিত।'

মৃদু হেসে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে কিশোর বাবু বললেন, 'সবটাই ছেলেটার ভাগ্য। আর যারা মেরেছে তারা সমাজের ও শাসনের ও আইনের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এ কাজ করেছে মা, সবটাই ছেলেটার ভাগ্য।' পরে মেয়েকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তুই ভাবিসনি মা, ডাক্তার আসুক। মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে, ছেলেটা সেরেই উঠবে।'

কিছুক্ষণ বাদেই ডাক্তার এলো। ছেলেটার হার্ট রাড প্রেসার, পালস, টেমপারেচার সবই পরীক্ষা করে দেখে মাথায় সাতটি ষ্টিচ করলেন ও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। এ্যাণ্টি-টীটেনাশ ও গ্লুকোজ ইনজেকশান করে বললেন, 'মনে হয় ছেলেটা—, অভুক্ত। ওকে কিছু খেতে দাও।' সুলতা বললো, 'একটু আগে গরম দুধ দিয়েছি কাকাবাবু।'

'বেশ বেশ তোমার মত নার্শ থাকতে ভাবনা কি? তাহলেও ওকে একটু ফলের রস দাও। আর জ্ঞান ফিরে এলে ডিম হাফ বয়েল করে দিও। তবে মনে হচ্ছে আজ দিনটা ওকে কোন ডিষ্টার্ব করা নয়। ওকে ঘুমতে দাও। পারলে এখান থেকে অন্য ভাল জায়গায় নিয়ে যাও। কেননা মাথার ইনজুরীটা নিয়ে চিন্তা আছে, জ্ঞান হতে বেশ দেরী লাগবে মনে হয়।'

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার প্রেসক্রিপশান লিখে ও ঔষধ খাওয়ানোর নির্দ্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

সুলতা সারা রাত জেগে ছেলেটার সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো। ভোর রাত্রের দিকে ছেলেটার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে সুলতা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো। ছেলেটি ধীরে ধীরে

চোখের পাতা খুলে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে, চেয়ে খুব আস্তে বললো, 'আমি কোথায়?'

ব্যাকুল হয়ে সুলতা বললো, 'তুমি ঠিক আছো কোন ভয় নেই। ডাক্তার বলছে চার-পাঁচ দিনেই তুমি ভাল হয়ে উঠবে।'

আরো বিস্ময়ে ছেলেটি প্রশ্ন করলো, 'আপনি কে?'

অতি স্নেহে সুলতা বললো, 'তুমি যার ব্যাগ উদ্ধার করতে গিয়েছিলে আমি সেই। তুমি আমাদের বাড়ীতেই আছো। এখন কোন কথা না বলে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, বেশী কথা বললে তোমার ক্ষতি হবে।'

একটু মৃদু হেসে ছেলেটা চোখ বুজে শুয়ে রইল ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে চোখ চেয়ে ছেলেটা বললো, 'আমার সঙ্গে একটা পুটুলি ছিল, সেটা কোথায়?'

সুলতা বললো, 'তোমার পুটুলির আর কোনো দরকার নেই। আমি তোমার নূতন জামা কাপড় গামছা আর অন্যান্য সবই কিনে দিয়েছি। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

সব শুনে ছেলেটা একটু মৃদু হাসলো ও বললো, 'মাথায় গায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি ঘুমোব।' পরে সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

পাঠকদের নিশ্চয় বলে দিতে হবে না ছেলেটা কে? সেই ছদ্মবেশী সমরেশ মজুমদার ওরফে রাইদিঘির সমর। সামন্ত ঘণ্টা দুই ঘুমের পরে, সমর জাগলে মা ও বাবার কথা মত সুলতা তার মা বাবাকে ডাকতে গেলো।

(ক্রমশঃ)

ডায়েরির পাতা থেকে সুব্রত চক্রবর্তী

বুধবার, ৯ মে, ১৯৭৩ নন্দ বারিক ছিল আমাদের ডিপার্টমেণ্টে মেকানিক। ছেলে পুলে নেই। মাস খানেক হল রিটায়ার করেছে। আজ সকালে ওর পেনসনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিল। ফলে, ওর আর একটা পরিচয় পেয়ে গেলাম।

বলছিল, অনেক খরচ ; পায়রার জন্যেই রোজ দেড় কেজি করে গম লাগে। জিজ্ঞেস করায় জানাল, সত্তর আশিটা পায়রা আছে, বছর তিনেকের শখ। প্রথমে ছিল দুটো ; তারপর বাচ্ছা হতে হতে হতে এই অবস্থা। কাউকে বেচতে মায়া লাগে। হয়ত পুষবে বলে নিয়ে গেল, কিন্তু বলা তো যায় না, যদি খেয়ে ফেলে ? বছর খানেক আগে হঠাৎ একসঙ্গে আমার তিরিশটা পায়রার বাচ্ছা মরে গেল। কিছুই বুঝতে পারলাম না। বৌটাকে জিজ্ঞেস করতে প্রথমে কিছু বলে না ; পরে লক্ষ্মী ঠাকুরের ছবি হাতে দিয়ে সত্যি কথা বলতে বললে, কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলে, অভাবের জন্যে আমাকে কিছু না জানিয়ে দুটো পায়রা বিক্রি করেছিল।

শুনে খুব রাগ হল। বৌটাকেই তাড়িয়ে দেব ঠিক করে-ছিলাম। পরে অনেক হাতে পায়ে ধরতে, এই রকম কাজ আর কখনও করবে না বলে লক্ষ্মী ঠাকুরের ছবি ছুঁয়ে অঙ্গীকার করতে তবে ওকে ঘরে নিই।

বললে বিশ্বেস করবেন না, কিন্তু এর পর থেকে পায়রাদের কোন অসুখ আর হয় নি, পায়রাও অনেক বেড়ে গেছে। আমিও ঠিক করেছি, নিজেদের যতই কষ্ট হোক, পায়রাদের ঠিক ঠিক খাইয়ে যেতে হবে। এখন রোজগার নেই, তাই কষ্ট।

শুক্রবার, ১১ মে, ১৯৭৩ আজকের কাগজে দেখলাম একটা ছোট্ট শোক সংবাদ। ষষ্ঠ পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের তলার দিকে ছয় লাইনের ছোট হরফে লেখা। চোখে পড়ার মত নয়। তবু চোখে পড়ে গেল।

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র, সুকুমার রায়ের ভ্রাতা, সত্যজিৎ রায়ের খুল্লতাত, শিক্ষাব্রতী ও লেখক শ্রীসুবিমল রায় ৭৬ বছর বয়সে গত সোমবার ৭ মে ১৯৭৩ কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন।

আমার সঙ্গে সুবিমলবাবুর পরিচয় খুব একটা উল্লেখ করবার মত। যতীন দাস রোডে মাসিমা থাকেন ; ওনার ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্যে সুবিমল বাবু ওঁদের বাড়িতে আসতেন।

খর্বকায় শীর্ণ চেহারার ভদ্রলোক, রঙ ফরসা। পরণে তাতের ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে কালো রঙের পাম সু। তবে সব চেয়ে চোখে পড়ত তাঁর দাড়ি।

দাড়িওয়ালা ও মোটা গোঁফের মালিকদের ছোটবেলায় খুব ভয় করে চলতাম ; ভাবতাম, ছোটদের ভয় দেখবার জন্যেই ওনারা গোঁফ-দাড়ি রেখে ও হঠাৎ কাছে চলে আসা উৎসুক ছোট ছেলে মেয়েদের আচমকা ভয় দেখিয়ে এক ধরণের মজা পান। কিন্তু সুবিমলবাবু ছিলেন এদের ব্যতিক্রম। তাঁর শিশু সুলভ সারল্য, দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখের মধ্যে দিয়েও, চোখ দিয়ে প্রকাশ পেত। নির্ভয়ে কাছে গিয়ে বসতাম, ভাব জমাতাম।

বড় হবার পর একদিনের কথা মনে আছে। তখন তার মাথার চুল ও গোঁফ-দাড়িতে বয়সের পাক ধরেছে। আমিও তখন কলেজে পড়ি। তাঁর লেখা রোজ নামচা-টা দেখিয়েছিলেন। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ; রূপ, রস, গন্ধ ভরা পৃথিবী সম্বন্ধে ছোট ছোট অভিজ্ঞতার কথা। তবে বিশেষত্ব এই যে, মনের এক এক ধরণের অনুভূতি এক এক রঙের কালি দিয়ে

প্রকাশ করার স্বকীয়তা দেখিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের রচয়িতা শ্রীম-কে চোখে দেখিনি। সুবিমলবাবুকে দেখে শ্রীম-র কথা মনে পড়ে।

উনিও তো ছিলেন মাষ্টার মশাই।

রবিবার, ১০ জুন, ১৯৭৩ সকাল সাড়ে ন'টার সময় দমদম এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছিলাম। দশটার সময় কোচবিহার যাবার ২৭৭ নং ফ্লাইটের প্লেন। বেলা দশটার সময় মাইকে ঘোষণা করল, যান্ত্রিক কারণে এই ফ্লাইটটি বাতিল করা হল। ভেতরে অবশ্য খবর পেলাম, আমাদের নিয়ে যাবার ডাকোটা প্লেনটি কোন সকালে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে চলে গেছে, কখন ফিরবে জানা নেই ইত্যাদি।

কোচবিহারের যাত্রীরা হতাশ হয়ে পড়লাম। একজন তরুণ ব্যবসায়ী বললেন, টিকিটের টাকা ফেরত নিয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল, পরের বুধবার না হয় আবার দেখা যাবে। এছাড়া দিনটাকেও খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘলা দিন। বাইরে কখন আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

যাত্রীদের দলে হাসিমারা চা-বাগানের এক এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। ছ'ফুটের ওপর লম্বা, রং ফরসা, দোহারা চেহারা, নাকের তলায় ছুঁচোল মোটা গোঁফ, মোটা জুলফি, বড় চুল,-তার ওপর কাপড়ের বাহারি টুপি। প্রথমে ভেবেছিলাম অবাঙ্গালি। ভুল ভাঙ্গলো যখন নাম জানলাম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। আগের বুধবারও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোচবিহার থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসে দমদম এসেছিলাম। আজ আবার একসঙ্গে ফেরা।

ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী করব। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে সাত পাঁচ ভাবছিলাম। এক সময় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কাছে এসে

জানাল, ওর টিকিটটা আজ বোয়িং ৭৩৭ এর বাগডোগরা ফ্লাইটে বদলে নিয়েছে কোনও বাড়তি টাকা না দিয়েই। এয়ার লাইনসের নিজেদের দোষে যখন কোচবিহারের ফ্লাইট বাতিল করেছে, তখন এর বিকল্প হিসাবে বাগডোগরা প্লেনে ব্যবস্থা করে দিতে আপত্তি নেই।

আমিও ২২১ ফ্লাইটের কাউনটারে আমার কোচবিহারের টিকিটটা বাগডোগরার জন্যে বদলে নিলাম ; ১২৫ টাকার বদলে ১৪৫ টাকার বোয়িং জেট প্লেন,—কোনও বাড়তি ভাড়া না দিয়ে। ফ্লাইট কণ্ট্রোল অফিসার মিঃ বসু কেবল জানিয়ে দিলেন যে, ওনারা শিলিগুড়ি পর্যন্ত পেঁছিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন,—কোচবিহার যাবার ব্যবস্থা নিজেদের করে নিতে হবে।

বোয়িং জেট প্লেনটি সোয়া বারোটায় দমদম ছেড়ে মাত্র ৪৫ মিনিটে বেলা একটায় বাগডোগরা নামল। পৌণে দুটোর মধ্যে নিজেদের মালপত্র ছাড়িয়ে নিলাম। বাগডোগরা থেকে টেলিফোনে বার দুয়েক রোডস ডিপার্টমেণ্টে শিলিগুড়ির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমল সরখেলকে যোগাযোগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। সঙ্গের শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। ওকে ভরসা দিতে বললাম, ভয় কি, এক ভদ্রলোক যদি ৮০ বছর আগে বিদেশে বিভুঁয়ে শীতের রাতে ষ্টেশনের এক প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ঢুকতে পারেন, তবে আমাদের অবস্থা তো অনেক ভাল। দেখাই যাক না বরাতে কী আছে। এতদূর যদি নিরাপদে নিয়ে এসে ফেলতে পারেন তবে বোঝা যাবে ঠাকুরের মতলব কী ?

কয়েকটা প্রাইভেট ট্যাক্সি মাথা পিছু চার টাকা নিয়ে শিলিগুড়ি পেঁছে দেবে বলে ঘোরাঘুরি করছিল। সরখেলের সঙ্গে ফোনের আশায় থাকায় ওদের এতক্ষণ আমল দিই নি। এবারে বাধ্য হয়ে ওদের একটায় দুজনে উঠে বসলাম। আট মাইল দূরে শিলিগুড়ি শহর। ভেবেছিলাম এই ট্যাক্সি করেই শক্তিগড়ে

সরখেলের কোয়ার্টারে হাজির হব। কিন্তু, শিলিগুড়ি শহরে ঢুকে মহানন্দা পার হবার পর বর্ধমান রোডের তেমাথায় এসে ট্যাক্সি-চালক গাড়ি থামিয়ে বলে বসল, আর যাব না, ভাড়া মিটিয়ে দিন।

দোনামোনা করছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, সামনের দিক থেকে একটা হলদে জিপ এসে রাস্তার ওপাশে দাঁড়ালো। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মনে আশা নিয়ে ট্যাক্সির দরজা খুলে ঐ জিপের কাছে ঘুরে এসে বলল,—"না, যা ভেবেছিলাম তা নয়। এটা আমাদের বাগানের জিপ নয়।" সামনে হয়ত কোনও গাড়ির আড়াল ছিল। সেটা সরে যেতে ঐ গাড়িটার নম্বর প্লেট দেখে চমকে উঠলাম,—WMA 5505, এটাতো আমাদের ডিপার্টমেণ্টের গাড়ি, চালকের আসনে পরিচিত কিষেন ড্রাইভার।

কিষেনের কাছে হাজির হতে, ও আমাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেল। জানালো, গত পাঁচ-ছয় দিন এক সেক্রেটারি সাহেবের ডিউটি করে মাত্র আধ ঘণ্টা আগে দার্জিলিং থেকে নেমেছে, এখনও বাসায় ফেরেনি। এ অবস্থায় আর কোচবিহার যেতে পারবে না। বললাম, কোচবিহার না পার, আমাদের অন্ততঃ সরখেল সাহেবের কাছে পেঁাছে দাও। ওকে রাজি করিয়ে সঙ্গের মালপত্র নিয়ে আমরা দুজনে জিপে উঠে বসলাম।

মনে সন্দেহ ছিল, সরখেলের দেখা পাব কিনা। কিন্তু, ওর কোয়ার্টারের কাছে গিয়ে দেখি, কয়েকটা জানলা খোলা। ভরসা করে কলিং বেল টিপতে সরখেল এসে দরজা খুলল। জানালো, মাত্র এক ঘণ্টা আগে দার্জিলিং থেকে নেমেছে। তাড়াতাড়িতে খিচুড়ি রান্না করে সবে খাচ্ছে। ওর দিদি কিছুতে ছাড়লেন না। ঐ খিচুড়ির কিছু ভাগ আমাদের দুজনের ভাগ্যেও জুটলো। কথায় কথায় প্রকাশ পেল শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদামশাই সরখেলের

সুপরিচিত, দুজনেরই ভাগলপুরে বাড়ি। ওখানকার গল্প জমল ভাল।

সরখেল ইতিমধ্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে, কিষেনের বদলে অন্য কোনও ড্রাইভার যোগাড় করার জন্য। আজ রবিবার, পাওয়া যাবে কিনা চিন্তায় ছিলাম। এই সময় হঠাৎ একটা চিঠি নিয়ে রায়গঞ্জের সুধীর ড্রাইভার এসে হাজির। আগে থেকে ব্যবস্থামত WMA 5505 জিপ গাড়িটা রায়গঞ্জ নিয়ে যাবে। ওকে বলা হল আপাততঃ ঐ গাড়িটা নিয়ে আমাদের কোচবিহারে পেঁাছে দিতে। শুনে, সুধীর খুবই রাজি। ওর বাড়ি কোচবিহারে। সেখানে ওর দাদারা থাকে।

সাড়ে তিনটের সময় শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে ওর হাসিমারার কোয়ার্টারে পেঁাছে দিলাম সন্ধ্যে হবার আগেই, সাড়ে ছ'টায়। কৃতজ্ঞতায় চশমার কাঁচের মধ্য দিয়েও ওর চোখ দুটো ছলছল করছিল। জানালাম, কতটুকু আর আমাদের কেরামতি। পর পর যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিরাপদে এখানে নিয়ে আসার সবটুকু কৃতিত্ব সেই অদৃশ্য বিধাতা পুরষের। অমরা ক্রীড়নক মাত্র।

চিলাপাতা ফরেষ্টের রাস্তা জিপের হেড লাইটের আলোয় তীব্র গতিতে পার হয়ে কোচবিহারে নিজের কোয়ার্টারে এসে পড়লাম রাত সাড়ে আটটার সময়। আমাকে অভাবিত ভাবে দেখে সবাই আনন্দে অবাক হয়ে গেল।

আমার অফিসের জিপ গাড়ির ড্রাইভারের আস্তানা এই বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে, নাম, বিশ্বনাথ। রাত দশটার সময় বাড়ির পেছনের বারন্দার অদূরে টিউবওয়েলে জল নিতে সে এসেছিল। আমি তখন খেতে বসেছিলাম। রহস্য করে শ্রীমতী ওকে জানালো, কি যে ভুল খবর দিলে বিশ্বনাথ, বলেছিলে আজ প্লেন আসবে না,

সাহেব আসতে পারবেন না। আর এই দেখ, সাহেব তো এসে গেছেন।

অবিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে বিশ্বনাথ ড্রাইভার ঘরের মধ্যে দেখতে এসেছিল। দেখার পরও নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে না পেরে বার বার হাত দিয়ে কচলাচ্ছিল।

রাতের দিকে বিশ্বনাথ সামান্য নেশাভাঙ্গ করে থাকে।

তৃতীয় পক্ষ মতি মুখোপাধ্যায়

সরে যাচ্ছে চাঁদ
উড়ে যাচ্ছে মেঘ
চাঁদ সরে নাকি মেঘ ওড়ে
নাকি স্থির দুজনেই
অস্থিরতা কেবলি আমার।

কখনো কখনো চাঁদ একা
আবরণ হীনা
একান্ত আদিম
দুর্লভ সেই দৃশ্যে দুচোখ পাথর
থাকি ভাষাহীন।

কেন মেঘে চাঁদে রেষারেষি
একজন নির্জনতা খোঁজে
দ্বিতীয় যখন ছায়াপথে
সে কি মাত্র তৃতীয় পক্ষ
আমার কারণে?

পরিব্যাপ্ত জল এক আমি রমলা বড়াল

মাঝে মাঝে মনে হয়
বসে আছি যেন এক দ্বীপের ভেতরে;
নাকি এই দ্বীপই আমি—চারদিকে হা-হা করে জল।
বহু দূরে দ্বীপমালা—যেন এক আদিম জীবন
অনড় রয়েছে শুয়ে।
মনে হয় নাম ধরে ডাক দিয়ে যাই।
হায়! নামতো জানি না, নামই নাই।
তবুও বাতাসে আসে পাখিদের স্বর—
অচিন সে স্বর,
কখনও বা ভেসে আসে ফুল
অচিন সে ফুল।
কান পাতি, হাত পাতি
বুকের ভেতরে কারো স্পর্শ লাগে যেন।
তখনই তো মনে হয়—
দ্বীপ নয়, আমি এক পরিব্যাপ্ত জল
ছুঁয়ে আছি আকাশ পৃথিবী।
দূরান্তের অস্তিত্বকে ঢেউ দিয়ে নাড়া দিয়ে যাই।
নিজের ভেতরে টেনে আনি।
দ্বীপ নয়, দেহ নয়, পরিব্যাপ্ত জল এক আমি॥

প্রশ্নের সনেট নীরেন্দ্র গুপ্ত

আমার এ জীবনের খেয়াতরী নিয়ে
ব্যথার সাগরে যদি চলে যাই একা পাড়ি দিয়ে,
তুমি তাতে কেন ব্যথা পাও ?
ছলোছলো চোখে কেন চাও ?
একাকী আঁধারে আমি জাপি যদি রাতি,
নাই যদি জ্বলে কোনো বাতি,
তুমি তাতে কেন ব্যথা পাও ?
তুমি এসে কেন বাতি জ্বেলে দিতে চাও ?
ফুল-ঝরা কাননের শূন্য সভায়
তৃণদলে বসে যদি বেলা কেটে যায়,
তুমি কেন চোখে আনো জল ?
কেন দিতে চাও পেতে তোমার আঁচল ?
দুখের অনলে একা মন
যদি জ্বলে যায় আজীবন,
তোমার কি আসে-যায় তাতে ?
তোমার হৃদয়ে কেন লাগে সে দহন ?

ধরিত্রী চক্রবর্তীর দুটি কবিতা

ডাক

ডাক এসে গেছে
বুকে বাজে পদধ্বনি বিলম্বিত লয়ে।
চলায় ফেরায় এখনও স্বাধীন,
যে কোনও মুহূর্তে সেটা হস্তান্তর হতে পারে।

তাই দূরের বন্দর গুলি ছুঁয়ে আসা,
আর জানিয়ে দেওয়া, এবারেই হয়তো শেষ দেখা
শেষের দিনের আগে।
আর কোনও কর্ত্তব্য নেই,
নেই কোনও দায়বদ্ধতা।

তাই, হে পদধ্বনি, কেন আর বিলম্বিত লয় ?
কখনও করোনি দয়া, এবার হও দয়াময় !

'প্রিয়েরে দেবতা'

ভেবেছিলেম ক'দিন ধরে হব অদর্শন,
নইলে কি আর আমার ঘরে ঘটবে পদার্পণ ?
রইনু জেগে সকল রাতি,
সবার ঘরে নিভলো বাতি,
তবুও তো হোলো না যে তোমার আগমন !!
চোখের জলে দৃষ্টি আঁধার,
শ্রান্ত দেহ বহে না আর,
চমকে উঠি, বাতাসেতে কিসের সুবাস যেন !
এসেছিলে ঠিকই তুমি,
ঘুমের মাঝে ছিলেম আমি।
ক্লান্ত শিরে শিথান খানি, কে যে কখন দিল আনি,
শীতল দেহে চাদরখানি কে ঢাকিল হেন,
এখন বুঝি, ঘরের মাঝে কিসের সুবাস, কেন !!

শ্রাবণ ওমর আলী

যখন দরকার তখন নেই ধান কাউন ঘাস গাছ গাছালি হলুদ
খরায় পুড়ে

বৃষ্টি আর মরার সময় পেলো না
বৃষ্টির মরা মাটি দিই…
রাগী স্ত্রীলোক বিরক্তি গালি গালাজ পিচ্ছিল কর্দমাক্ত
রাত নেই দিন নেই সকাল থেকেই এই ঝরানি
পিচ্ছিল কর্দমাক্ত যেন বৃষ্টির
অনবরত প্রসবের পথ…হাঁটা চলা যায় না…
খড়ি ভেজা কাপড় জামা গামছা ব্লাউজ সায়া লুঙ্গী
ওড়না কামিজ সালোয়ার পায়জামা প্যান্ট ভেজা আধশুকনা
ভ্যাপসা দুর্গন্ধে ভরা ঝুলছে দড়িতে
কবে যে শুকাবে ঠিক নেই
খড়ির চুলায় অনবরত ফুঁ পাড়তে পাড়তে
দম আটকে আসে
চোখ জ্বালা করে পানিতে ভরে লাল হয়ে ওঠে
এভাবে ভাত তরকারী রাঁধা যায় না যে পারে রাঁধুক
বাইরে কতোবার ভিজে ভিজে পানি আনা যায়
প্রকৃতির ডাকেও তো সাড়া দেয়া দরকার
একজন টাকা দেবে সে আসেনি বৃষ্টির জন্যে কত দরকার এই
টাকা

বৃষ্টির মরা মাটি দিই
বৃষ্টি আর মরার সময় পেলোনা
কতো দরকারী কাজ বন্ধ হয়ে থাকে মরা বৃষ্টির জন্যে
বাজার-ঘাটও করার জো নেই

এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়
যাওয়ার ও কি উপায় আছে কার কয়টা ছাতা আছে
অত চড়া রিকশা ভাড়া আছে
গরু বাছুর গুলো মলো আর কতো ভিজবে
ধান কাটা হলেও পালায় পচে
ধান খড়ই কি আরাম মতো আলাদা করার শুকানোর জো আছে
বৈতালিক নারীর মতো রোদ যদি একটু বেরিয়েই হাসে
অমনি বৃষ্টির কান্না শুরু হয়ে গেলো
দিলো সেই হাসি নিভিয়ে এক ফুৎকারে হিংসায়
ছাগল বকরীগুলো থাক আর না থাক
শুকনা জায়গায় বেশ আরামেই শুয়ে আছে
নিশ্চিন্ত জাবর কাটছে…
আরাম লেপ কাঁথা চাদরে…ডিম গরম খিচুড়ি হলেই চলবে…
এমন দিনে তারে বলা যায়…

ঈশ্বরের ঠিকানা বিশ্বনাথ মাঝি

মানুষের প্রতিটি দুঃখময় দিনরাত্রি
মানুষকে বাঁচতে শেখায়।
মানুষের দৈনন্দিন ভালবাসা ও প্রেম
তাকে ঈশ্বরের ঠিকানা বলে দেয়।
মানুষের প্রতিটি বিশ্বাসই ঈশ্বর।
মানুষের দুঃখময়তা ও প্রেম
মানুষকে ঈশ্বর করে তোলে॥

দুর্গা মা ও আমার মা আরাধনা গুপ্ত

আমার নিজের মা
কত কষ্টে মানুষ করেছেন আমাকে—
সাতাশি বছরে চলে গেলেন তিনি
আয়া ও আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন
শয্যাশায়ী হয়ে তাঁর কষ্ট ভাবা যায় না।
মুখে জল দিলাম মৃত্যুকালে
মুখে আগুন দিলাম মেয়ে হয়েও,
মায়ের ফটোতে দিই পদ্মের মালা
যুঁই রজনী গন্ধা ও বেল ফুলের মালা
মা যেন বলেন ফটো থেকে
"খুকু তোকে আশীর্বাদ জানাই"।
হ্যাঁ আশীর্বাদ বুঝতে পারি

মাগো সামনের দুর্গা পুজো
ভাবছি এবার তোমাকে ছাড়া
দুর্গা মাকে ভাবা যায় ?
তবু পুজো আসছে—চিরদিন আসবে
আলো ঝলমল সন্ধ্যায় বাজবে মাইক
আমি তখন তোমার ছবির সামনে
দাঁড়িয়ে তোমায় স্মরণ করব—
দুর্গা মা ও তুমি তখন এক হয়ে যাবে।

চির বিদ্রোহী তুমি পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

[বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি]

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে তোমার নাম—নজরুল ইসলাম,
চির বিদ্রোহী তুমি মানুষের ব্যথা জেনেছো নিবিড় ভাবে—
যেখানে পীড়ন যেখানে অত্যাচার সেখানে তোমার প্রতিবাদ।
মানুষ যখন দুঃখে কাঁদছে তোমারও হৃদয় কাঁদছে…
দহন জ্বালায় জ্বলছো তুমি মানুষের প্রিয় নাম নজরুল ইসলাম।
চির বিদ্রোহী নজরুল তুমি চির বিস্ময়, শুধুই বিস্ময় !
তোমার লেখনী অগ্নিবৃষ্টি আনে, তোমার গানে মানুষের ঘুম ভাঙে,
তাই মানুষ তোমাকে ভোলেনি ইতিহাস মনে রেখেছে।

হৃদয়ের জানালা মানিকচন্দ্র দাস

হৃদয়ের জানালা খুলে শুয়ে থাকি একা
থিক্‌থিকে অন্ধকার—
আকাশের তারাফুল ঝুলে থাকে শূন্য উদ্যানে।
উষ্ণরাতের অন্ধকারে
কেটে যায় চিলবিলে সময়—
তখনো কেউ জন্মেনি হাসির শব্দে।
বাউণ্ডুলে বাতাসে জানালার শব্দ
ভেঙে দ্যায় যাবতীয় স্বপ্ন—
আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্দুর।

রমণ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঙ্গা আয়নায় নিজের বিক্ষত মুখখানার মত
কিম্ভূত ভবিষ্যতের একটা রেখাচিত্র
সুখী দাম্পত্য-জীবনে খলনায়কের মতন আড়ি পেতে
আছে—
দু-চোখ আকর্ণ বিস্তারে ভীতু-ভীতু আমি,
অথচ—
অনিবার্য ক্রুর দৃশ্যটাকে কিন্তু
হাত-সাফাই করা যায় না।
এটা জানি।
তবু, নিজেকে কুকুর বানিয়ে
গলায় বকলেস দিয়ে
ওকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বার হই।
বিস্ময়! আশ্চর্য্য! অভাবনীয়—
ইত্যাদি—ইত্যাদি…
হাস্যকর মনন-রমণ,
আমরা ছেলে-ভোলানো খেলায় মেতে আছি।

রোগশয্যায় অর্চিতা রায় চৌধুরী

দিন-রাত শুধু শুয়ে থাকি বিছানায়,
জানালার সার্সির বাইরে এক টুকরো নীল আকাশ।
সাদা আর কালো মেঘেদের দেখা যায় আনাগোনা,
বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে কখনও তারা জানালায়।

শুয়ে শুয়েই গন্ধ পাই সোঁদা মাটির, ভেজা বাতাস,
আনমনা হয়ে বুক ভরে শ্বাস নিই।
কষ্ট ডাকে গাছের ডালে, চড়ুই উড়ে যায়,
পাখিটাকে ছুঁতে চেয়ে হাত বাড়াই।
কষ্ট হয়, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারিনা,
ভাঙা পা-খানা অবশ,
উঠতে চেয়েও উঠতে পারিনা তাই।
বাতি নেভা ঘরে জমে অন্ধকার,
কোথাও যাবার উপায় নেই আর।

আলোর ঝলকানি থেকে দূরে

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চেয়েছিলেম মায়া-ঘেরা নিটোল এক শান্তির নীড়
বদলে পেলাম যা, ঠিক আধুনিক সিনেমার সেট যেন
যত ঝকঝকে তত নিষ্প্রাণ—।
চেয়েছিলেম একরাশ অবাধ মুক্ত আকাশ
বদলে খালি একমুঠো ধোঁয়াভরা বিষণ্ণতা দিলে কেন?
বারান্দার কাঁচ আর বাহারী গ্রীলের ঘেরাটোপে
ক'টা ম্লান পাতা, বাঁকাচোরা মহার্ঘ বনসাই দেখে দেখে
সতেজ, পেলব প্রকৃতির স্বাদ কি মেটে?
ভেবেছিলেম পাশে থাকবে একটা মন ঝর্ণার মত নির্মল
সাগরের মত গভীর
কিন্তু কাছে পেলেম ডোবার ধরা জলের সর্বনাশা
আবিলতা!

পার্লার বুটিক আর ক্লাব ঘোরা কাঠামে
নেই কোন কবোষ্ণ হৃদয়ের খোঁজ—
কত কাছে, তবু কত দূরে—মাঝে বৈভবের দেয়াল
আছে মাথা তুলে।
আঁধারের রূপ, রঙ কখনও চোখ মেলে দেখেছ কি
আঁধারকে একবারও মন দিয়ে স্পর্শ করেছ কি ?
চলো,—এখনও সময় কিছু আছে
আলোর ঝলকানি থেকে দূরে—
বহু দূরে দুজনে যাই চলে
আঁধারের স্নিগ্ধতায় চিনে নিই নতুন করে
আত্মার আলোয়।

আমি মুখ্যমন্ত্রী হব ইরা চক্রবর্তী

স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন আমরা স্বাধীন
মাথা উঁচু করে বলি আর নহি পরাধীন।
ইচ্ছা মত জেগে উঠি ইচ্ছা মত খাই
ইচ্ছা হলে কাজ ছেড়ে ঘরে চলে যাই,
বন্ধ করি গাড়ী ঘোড়া কল-কারখানা
তাহাতে কি ফল হবে নাহি যায় জানা
কেহ যদি প্রশ্ন তোলে "কিবা হবে ফল ?
ধন যাবে প্রাণ যাবে সবই বিফল"।
আমি বলি "বৃহত্তর স্বার্থের কারণ
যেতে পারে কিছু ধন, আর কিছু প্রাণ।
তোমার অন্ধের যষ্টি ? তাতে কি হয়েছে ?
আরো কত যষ্টি দেখো পিছে পড়ে আছে,

নিজেকে আলাদা করি কেন ভাব মনে
যখন ফলিবে ফল পাবে জনে জনে ।।
কি ফল ফলিবে শেষে আর কোন কালে ?
তাতো মোর জানা নাই ভগবানই জানে
দুধ বলে শিশুদের বিষ তুলে দিই
মার বুক থেকে শিশু ক্লেসেতে পাঠাই
শিক্ষার নামেতে চালাই অজ্ঞতার শেষ
ধাপ্পা দিয়ে যুব শক্তি করি নিঃশেষ
নেতা আমি ভোট দাও অন্ন বস্ত্র পাবে
না দিলেও জেন কিছু এসে নাহি যাবে।
নেতা আমি, আমি চাই টাকা কড়ি নাম
সম্রাটের রাজদণ্ড ললনার প্রাণ
শিক্ষা দীক্ষা ন্যায় নীতি সব ভুলে শেষে
নিজেকে দেখিতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বেশে ।।

সিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

কেন ?

ধূপ— গন্ধ বিলায়ে ফেলে আপনারে নিঃশেষী
ফুল— শোভা ও সৌরভে আলোকিত করে দশদিশি।
বৃক্ষ— সেবিছে সবারে সদা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া দিয়া,
পাখী— তার মোহন রূপে ও মধুর কাকলিতে ভরে দেয়
হিয়া ।।

নদী— তৃষ্ণা ও সেচের জল যোগাইছে নিত্য,
সমুদ্র— রত্নাকর দিতেছে মণি আদি কত অমূল্য বিত্ত।
সূর্য— আলোক ও জ্যোতির প্রকাশ জীব প্রাণ পায়।
চন্দ্র— জোয়ার ভাঁটা, স্নিগ্ধ কিরণ ছড়ায় ।।
মানুষ— হায় সে নাকি ঈশ্বর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব হয়,
তাহলে ওদের মত উদার কেন নয় ?

চা-কাহানী

সকাল হলেই আমরা যারা তথাকথিত গৃহস্থ।
পাহাড়-পুরের গাছের পাতা হই তোমারি দ্বারস্থ ॥
ভোর হল যেই, ঘুম গেল সেই, স্মরণ নিল চিত্ত।
গাছের পাতা, চিনির বাটা, সাত সকালে নিত্য ॥
শীতের দিনে, বর্ষাপ্রাতে, নিদাঘ রাতে, বসন্তে।
গাছের পাতা মেটায় তৃষ্ণা ঘুম কেড়ে নেয় ত্বরিতে ॥
দেহ হল সুস্থ সবল, মন চলে যায় দিগন্তে।
দুটি পাতা একটি কুঁড়ির জবাব নেই অনন্তে ॥

ছবি আঁকি বাজীরাও সেন

মাঝে মাঝে মেঘের মায়াবী থেকে
রং মুছে নিয়ে ছবি আঁকি দক্ষিণের জানালার কাচে,
তোমার মুখের ছবি—,
দীপান্বিতা ললাটে যার বৈশাখের দল মেলা
কৃষ্ণচূড়া পলাশের স্বর্ণ সমারোহ।
দেখি আর মনে মনে মানচিত্র প্রসারিত করি জীবনের।
ছোট্ট ঘর নিকোনো উঠোন,
সন্ধ্যায় ধূপের ধোঁয়া আরতির শাঁখ।
রাত্রি ভোর আকাংখার স্পর্শসিক্ত নিবিড় বিশ্রামে
ফুলকুঁড়ি স্বপ্নগুলো ভীড় করে এসে।
কিন্তু হায় ! এ যুগের আত্মমগ্ন চণ্ডাল রোদ্দুরে
সব কিছু রং চটে ঝরেছে ধুলোয় ।

শিশুদের বিছানায় ও পশুর উল্লাস।
সাপদের চেরা জিভ বিন্দু বিন্দু বিষ ঢালে খালি।
আলো নয়, সব কিছু আলেয়ার বণিক ছলনা।
চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার।
তোমার মুখই নয়, মুখোশের প্রেতচ্ছায়া
পরিস্ফুট হয় বার বার।

শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী সান্যাল

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি তুমি।"
স্বাধীনতার মন্ত্র বুকে লয়ে তুমি গেয়েছিলে স্বদেশের গান
শত শহীদের শেষ বাণী কান পেতে শোনা যায়
এ দেশের মাঠে-ঘাটে।
বঙ্কিম আর নজরুল গান গেয়ে
সুভাষ ও গান্ধীর আশিস্ নিয়ে গড়ি মোরা এ দেশ।
ঘুচুক সব বন্ধন, টুটে যাক অমা-কারা-নিশা
ফুটুক হাসি সব কিশোর তরুণের মনে
আমরা করব না ভয়, জানি মোদের হবেই হবে জয় ॥

অগ্নিগর্ভা গৌরী মল্লিক (দেববর্মণ)

টুকরো, টুকরো বস্ত্রে
বৃহৎ বৃহৎ নামাবলি
ঊর্দ্ধ বাহুতে জ্বলন্ত মশাল,
চন্দন কাঠের চিতায়
সতীদাহ।

ঈশান কোনে জমাট মেঘ
শঙ্খ শুভ্র খই—এলোমেলো
আজাচিত হৃদয় বিদীর্ণ ধ্বনি
স্বজন হারার বুকে দাবানল
মাতৃহারা শিশু আর সন্তানহারা
—জ্বলন্ত সতীর
মিলিত ক্রন্দন।
অগ্নিগর্ভ হতে দুটি বাহুর—
ঊর্দ্ধে প্রসারণ ॥

অনাবৃত স্বর্গ দর্শন শিল্পীমিত্র

[তন্ধুবর বেণীমাধব, অসিত রঞ্জন ও গৌরাঙ্গকে নিবেদিত]

চিত্রাঙ্কনে—ভাস্কর্যে—চলচ্চিত্রে—জীবন্ত বা বাস্তবে
অপ্রত্যাশিত- ভাবে নিম্নের সকল ক্ষেত্রেই হঠাৎ ঃ

যখন কোন উলঙ্গ শিশু বা বালককে দেখি,
তখন দেবদূতের কথা মনে পড়ে আমার
কিংবা ননীচোর শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-রূপ
কোন উলঙ্গ বালিকাকে যখন দেখি
তখন মনে পড়ে পরী বা বালিকা-দেবকন্যার কথা
যখন কোন কিশোরীর উন্মুক্ত সদ্যস্ফীত বক্ষ দেখি—
তখন গোলাপ বা পদ্মের কুঁড়ির কথা মনে পড়ে
যখন নির্জনে-গোপনে বা গ্রামের পুকুরের জলে স্নানরতা
কোন ষোড়শী বা অষ্টাদশী যুবতীর সুডৌল—

নিটুট-উদ্ধত স্তন যুগল দেখি—
তখন সমুদ্রের অত্যুচ্চ ঢেউ বা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল
কিংবা ডালিম-ফলের কথা মনে পড়ে আমার
যখন বৃষ্টিতে সিক্তবসনা তন্বী ললনার
আঁটোসাটো উদ্ভিন্ন-দেহের প্রতিটি স্পষ্ট বিভঙ্গরেখা দেখি—

তখন পর্বতের শৃঙ্গ ও উপত্যকার কথা মনে পড়ে
যখন কোন সম্পূর্ণ বিবসনা ক্ষীণকটি—
গুরুনিতম্ব-পীনস্নোতবক্ষা যৌবনবতী নারীকে দেখি—
তখন শৈল্পিপক-সুষমান্বিত 'স্ট্যাচু অব ভেনাস'
বা মাইকেল এঞ্জেলোর প্রেমিকার মর্মর মূর্তি
কিংবা স্বর্গোদ্যানের প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণরতা
সহজ-সরল-নিষ্পাপ নগ্নিকা 'ইভ'-কে মনে পড়ে
কিংবা বৃন্দাবনে সরোবরে স্নান ও জলকেলিরতা
শ্রীকৃষ্ণের সেই নিরাবরণ গোপিনীদের কথা মনে পড়ে
দৈবাৎ যখন কোন স্নেহময়ী জননীকে অনাবৃত বক্ষে
তাঁর শিশুসন্তানকে সযতনে স্তনদুগ্ধ পান করানোর দৃশ্য
দেখি—

তখন মেরীমাতার কোলে শিশু-যিশুর
স্তনপানের ছবি বা ভাস্কর্য মনে পড়ে আমার
এবং তখন এক স্বর্গীয়-সৌন্দর্য দর্শনে
আমার দুচোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে যায়
সার্থক হয় আমার জীবন।
আর ওই উপরে-বর্ণিত দৃশ্যাবলীর
প্রতিটি স্বর্গীয়-রূপ আমার মন-প্রাণের গভীরে
এক-একটি চিন্ময় নিটোল অপরূপ কবিতার জন্ম দেয়।

পুস্তক পরিচয়

বাংলার প্রকৃত নবজাগরণ

শ্রী অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পাঁচটি নিবন্ধের একটি সংকলন-গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য ও বাংলার নবজাগরণ'। লেখক শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী। নব ভারতী ভবন ৩১-এ, পটুয়া টোলা লেন, কলিকাতা—৯, মূল্য—পঁচিশ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধটি একটি তুলনামূলক আলোচনা। বিষয় 'নব জাগরণ'। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তথাকথিত নব জাগরণ—এর মধ্যে সঠিক নব জাগরণ কোনটি? উত্তরে লেখক বলেছেন, 'ইউরোপের ভাবধারা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে যে নতুন প্রাণ শক্তির উচ্ছাস জেগে উঠেছিল তাকেই সাধারণত রেনেশাঁ বা নব জাগরণ বলা হয়।' আরো যা বলেছেন তা সংক্ষেপে মোটামুটি এই রকম ঃ সেই উচ্ছ্বাস বা প্রেরণা মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমিত ছিল। বৃহত্তর সমাজ জীবনে তার কোন উল্লেখ-যোগ্য প্রতিফলন দেখা যায় নি। এমন কি যাঁরা নবজাগরণের ধ্বজাদারী তাঁরাও একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ভাবধারাকে পুরোপুরি হজম করতে পারেন নি, তেমনি অপরদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সনাতন ধর্মের আদর্শও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। এতদ্ সত্বেও ইংরাজী শিক্ষার ফলে মানুষ ক্রমশ পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনাদর্শের প্রতি অনুকরণ-প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য ইংরাজী সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রভাব সাহিত্য সৃষ্টিতে যতটা প্রতিফলিত হয়েছিল, লোকজীবনে তার উল্লেখযোগ্য কোন স্বীকৃতি দেখা যায় নি। পক্ষান্তরে, লেখক বলতে চেয়েছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনে যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটেছিল তা অভূতপূর্ব। বাঙ্গালীর

ধর্ম চেতনা শুধু শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় বা নির্দিষ্ট উপাসনা বিধির অনুবর্তনে পুষ্ট হয় নি; জনচিত্তের সজীবতার স্পর্শে, গোষ্ঠীগত মিলনের উত্তাপে ও ভাব-বিনিময়ে প্রাণোচ্ছল হয়েছে এবং জীবনের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেছে। উপসংহারে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সমাজ ও ব্যক্তি-মানসের সমস্ত স্তরে নতুন সৃষ্টির প্রাণৈশ্বর্যকেই প্রকৃত 'নব জাগরণ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

আসলে 'নব জাগরণ' শব্দটির অর্থ—নতুন রূপে জেগে ওঠা, অর্থাৎ আত্মসচেতনতা যখন নবতররূপে পুষ্ট হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই তাকে 'নব জাগরণ' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে হয়। আত্মবিপন্নতা নয়, আত্ম-পরিপুষ্টি। নব জাগরণ আত্ম সচেতনতার সহায়ক। তৎকালীন সমাজে তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। মানুষ সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ক্রমশ দেখা গেল পাশ্চাত্য শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞতাপ্রসূত ঘৃণা, আর পাশ্চাত্যের সব কিছুর নির্লজ্জ অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াস। এই কি জাগরণ, না বিস্মৃতি? ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে দেড়শো বছর আগে যা অংকুরিত হয়েছিল একবিংশ শতাব্দীর দরজায় এসে তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পাশ্চাত্য অনুকরণ সামান্য কিছু শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা সমাজের কোন স্তরেই বাদ নেই।

দ্বিতীয় নিবন্ধটি দীর্ঘতম। শিরোনাম 'চৈতন্য ধর্মের স্বরূপ'। লেখক প্রথমেই বলেছেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ধর্মীয় অর্থাৎ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাঁকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলা হয়েছে। মহাপ্রভুর ৪৭ বছরের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনের দুটি অংশ। একটি নবদ্বীপ লীলা অন্যটি নীলাচল লীলা নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে যুগ প্রবর্তক ঈশ্বর-

রূপে দেখেছেন। নীলাচল লীলার সঙ্গীরা তাঁকে রাধাভাব-দ্যুতি-কৃষ্ণ-স্বরূপ দেখেছেন। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য মহাপ্রভু ভিন্ন উপায় গ্রহণ করেছেন। তিনি অহিংসা ও প্রেমের ভিত্তিতে জাতি গঠন চেয়েছিলেন। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে যারা চিরকাল অবহেলিত তাদের ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুল বিচার'। চৈতন্যধর্ম মূলত ছিল সহজসাধ্য ভক্তি ধর্ম। শুধু নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদ্বোধন করাই ছিল এই ধর্মের মূল লক্ষ্য। মহাপ্রভু রচিত 'শিক্ষাষ্টক' যেমন চৈতন্য ধর্মের সরল রূপ তেমনি চৈতন্য ধর্মের দার্শনিক মতেরও স্বাক্ষর। সূত্রাকারে এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিরূপ। লেখক শিক্ষাষ্টকটি ব্যাখ্যাও করেছেন।

মহাপ্রভু মাধব সম্প্রদায়ের ঈশ্বর পুরীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মাধব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বলদেব বিদ্যাভূষণ দ্বৈত-বাদকে গ্রহণ না করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাপ্রভু তাঁর ধর্মমতের দার্শনিক রূপ দেবার জন্য শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মাধ্যম-রূপে নাম-কীর্তনকেই বেছে নিয়েছিলেন। সাধ্য সাধন তত্ত্ব বিষয়ে মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'যেইজন কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য'। আরো বলেছেন, 'কলিযুগ-ধর্ম নাম সংকীর্তন'-কলিতে যজ্ঞ নেই অন্য কোন তপস্যাও সেই। কলির একমাত্র মন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের মহামন্ত্র ঃ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

তৃতীয় নিবন্ধটির শিরোনাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও জীবন চর্যা'। এখানে আলোচনা শুরু হয়েছে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ'

তত্ত্ব নিয়ে। বলা হয়েছে, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদও আছে অভেদও আছে। উপমা দেওয়া হয়েছে অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিকণা, জীবও তেমনি ব্রহ্মকণা। পরবর্তী আলোচনা ভক্তি সাধন নিয়ে। যে সকল আচরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় তাকে বলে সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকার। বৈধী ও রাগানুগ। শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে কৃষ্ণ ভজনা করাকে বৈধীভক্তি বলে। আর ব্রজের ভক্তগণ স্বাভাবিক অনুরাগ বশে শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা পরিচর্যা করেন তাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা এবং প্রেয়সীগণ যথাক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য ভাবের ভক্ত। বৈষ্ণবদের জীবনাদর্শে দেখা যায় তাঁরা মাথায় শিখা রাখেন, গলায় মালা পরেন, শরীরে তিলক ব্যবহার করেন ও ব্রত-উপবাস পালন করেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে কিছু অবশ্য পালনীয় কর্ম আছে। যথা, সাধু বৈষ্ণবের সেবা যত্ন, সমবেত কীর্তন, মান মর্যাদার আশা না করে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ ও অন্যকে যথাযোগ্য মান মর্যাদা দেওয়া। উপসংহারে লেখক যে দুজন বৈষ্ণবাচারীকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন তাঁদের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের একজন তাঁর পিতামহ চন্দ্রমাধব গোস্বামী প্রভু আর অন্যজন তাঁর পিতৃদেব আদিত্যকুমার গোস্বামী প্রভু। পিতামহ ছিলেন বৈষ্ণব সাধক এবং পিতৃদেব ছিলেন দেশপ্রেমিক, কবি ও বৈষ্ণব-আচার্য, ধর্ম প্রচারক। আলোচনাটি শেষ করেছেন আদিত্যকুমারের একটি পয়ারবদ্ধ উপদেশ তত্ত্ব দিয়ে।

'প্রসঙ্গ ঃ অমিয় নিমাই চরিত' শিরোনামটি চতুর্থ নিবন্ধের। যাঁদের এই গ্রন্থটির বিষয় ও মহাত্মা শিশিরকুমার সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই তাঁরা এই রচনাটি পড়লে অনেক কিছু জানবেন ও আনন্দ পাবেন। এই নিবন্ধটি লেখার জন্য প্রণয় বাবুকে ধন্যবাদ জানাই।

অন্তিম নিবন্ধটির শিরোনাম 'বৈষ্ণব দর্শন ও আধুনিক দুনিয়া।' এখানে লেখক আমাদের এক অভিনব বার্তা শুনিয়েছেন। পৃথিবীর মনুষ্য জাতির মধ্যে অর্ধেক নারী। সেই নারী জাতি আজ দুনিয়া জুড়ে শোর তুলেছে, তারা পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত, অবহেলিত, অপমানিত, বঞ্চিত ও শোষিত। অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে নারীই আদর্শ। নারী জাতির নম্রতা, করুণা, স্নেহ ও সেবাপরায়ণতা তাঁদের কাম্য। তাঁরা নারীত্বের অনুশীলন করে আদর্শ নারী হতে চাইছেন। সারা পৃথিবীর নারী সমাজের জন্যে এর চেয়ে বড় খবর আর কি হতে পারে?

এর গ্রন্থের পাঁচটি প্রবন্ধই গত তিন-চার বছরে বিভিন্ন বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের জন্ম একটি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে। তিনি নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু অর্জনই করেন নি, সেই ইতিহ্য বহন করেও চলেছেন। তিনি জানেন ধর্মের তত্ত্ব গুঢ় অর্থাৎ দুর্বোধ্য। সাধারণ মানুষের কাছে সেই তত্ত্ব সহজবোধ্য নয়। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মোটামুটি জ্ঞাতব্য সব কিছুই অতি সংক্ষেপে সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থটিতে সমাবেশ করে একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন।

দেবকীনন্দন বাসুদেবের শ্রীচরণে প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা করি, গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও শ্রীগোস্বামীর দীর্ঘ জীবন।

মতামত

'অনুরাগ' বইমেলা ৯৮ ও ২৫ বৈশাখ ১৪০৫ পড়লাম। ডাঃ নগেন নিয়োগীর 'মানুষ নেই' নীরেন্দ্র গুপ্তের 'দরজা' ধারিত্রী চক্রবর্তীর 'তবে হঠাৎ' রণজিৎ মিত্রের 'প্রতিকৃতি' অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নতুন শতাব্দী' খুব ভাল লেগেছে।

হরি ভট্টের 'বিয়োগ থেকে যোগ' এবং মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'কাজের লোক আসে নি' সকলেই উপভোগ করেছে।

কামনকরি 'অনুরাগ' দীর্ঘস্থায়ী হোক।

—প্রদীপ মণ্ডল, ঠাকুর নগর, ২৪ পরগণা (উঃ)

'অনুরাগ' বইমেলা সংখ্যায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' গল্পটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। আমাদের পাড়ার ক্লাবে একজন অতি স্থূলকায় সভ্য আছে। তাকে অনায়াসে নায়িকা সাজানো যায়। যদি গল্পটি দু ঘণ্টার নাটক আকারে রূপায়িত করে দেন তবে বিশেষ বাধিত হব।—কুন্তলা দেবী, বৈদ্যবাটী।

শ্রদ্ধেয় প্রণয় বাবু, আপনার চিঠিতে জ্ঞাত হলাম একটি ক্লাব আমার 'অমিত্রাক্ষর' গল্পটির নাট্যরূপ চায়। চিঠির মাধ্যমে এই সংবাদ জানানোর জন্যে আপনার এবং শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্যের কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ রইলাম।

'অনুরাগ'-এর আরো অনেক সাফল্য কামনা করি। আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্যই সুদূর হুগলী থেকে পাঠক-পাঠিকারা আমার লেখার যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। আজই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।—রবিন দে, কলকাতা-২৭

আপনার পত্রিকা 'অনুরাগের' পরিচিতি পড়েছি 'সাহিত্য-সেতু'-তে। চোখে দেখি নি। তাই যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এই চিঠি।—জগৎদেবনাথ, নাসিক, মহারাষ্ট্র।

'অনুরাগ'-এ অনেক ভাল লেখা আছে। মুদ্রণ পারিপাট্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। নীরেন্দ্র গুপ্তের 'দরজা' চমৎকার। কিন্তু কতকাল দরজা বন্ধ করে রাখবেন নীরেন্দ্র গুপ্ত? 'গদ্যে চৈতন্য-চরিতামৃতে'র সমালোচনা ভারি সুন্দর। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয় বাবুর নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। ধীরা ভট্টাচার্য ও ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক সমালোচনা মনোজ্ঞ। 'অনুরাগ' মনোযোগী পাঠকের চোখে পড়বে।

—অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি।

ASSET INTERNATIONAL

Internationally Certified Courses
ISO 9001 Certified
Operating in 10 Countries World Wide
Over 1000 Centres Around The World

A. Q. A. D

- Oracle
- Developer 2000
- Power Builder
- Visual C++ with MFC
- Visual J++
- Visual Basic
- Windows NT
- Personality Development Workshop
- SQA & SPM

A. Q. P. P

- Basic H/W Concepts
- Windows 95 & 98
- OOP Through C++
- Networking Technologics
- Windows NT Server+w/s
- Visual J++(Java)
- CGI Scripting+HTML
- Orcale 8, Developer 2000
- Internet
- Visual Basic+ActiveX

APTECH LIMITED

ASSET International

Certified Computer Course
A Division of Aptech Limited

CA-38 SECTOR-1. SALT LAKE CITY. Cal 700 064. P. 358 5949

Edited and published by Sm. Dhira Bhattacharya M. A, from 34/2, Mahim Haldar Street, Calcutta-700 026